আর্য্যলক্ষ্মী

"বাঙ্গলার বীর," "মেবারকাহিনী," "ছেলেদের শিবাজী,"
"ছোটদের নীলদর্পণ," "অভিমন্যু," "শ্রীমন্ত,"
"কালকেতু," "চাঁদ সদাগর," প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
কলিকাতা
১৩৩৭

 মূল্য বার আনা

প্রকাশক—
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার :—শ্রীসত্য গোপাল নাগ, কর্ত্তৃক
৪ নং মুক্তারাম বাবুর লেনস্থ
"সোয়ান প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

স্বর্গীয়া

জননীর

পুণ্যোজ্জ্বল

স্মৃতির

উদ্দেশে

সূচী

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	সীতা	...	...	১
২।	সতী	...	...	২০
৩।	অরুন্ধতী	...	...	৩২
৪।	গার্গী	...	...	৪১
৫।	সাবিত্রী	...	...	৫২
৬।	শৈব্যা	...	...	৬৬
৭।	দময়ন্তী	...	...	৮২
৮।	চিন্তা	...	...	১০৩
৯।	অনসূয়া	...	...	১১৯
১০।	বাক্‌পুষ্টা	...	...	১২৬
১১।	ক্ষমাবতী	...	...	১৩৩

আর্য্যলক্ষ্মী

সীতা

মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা সীতা ভারতের নিজস্ব। জগতের কোনও ইতিহাসে, কোনও কাব্যে, কোনও নাটকে এমন পাতিব্রত্যের আদর্শ নাই। বাল্মীকির সীতা জগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সীতার চরিত্র-সৌরভ একটুও পরিম্লান হয় নাই। আজিও আসমুদ্রহিমাচলের সমগ্র হিন্দুজাতি সেই অলৌকিক পবিত্র চরিত্র গাঁথা গাহিয়া ধন্য হয়, আজিও পল্লীর কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদে ভক্তিসহকারে পতিগতপ্রাণা সীতার কাহিনী পঠিত হইয়া থাকে,—আজিও সীতার সতীত্ব-গৌরবের স্বর্গীয় জ্যোতিতে হিন্দুর প্রত্যেক গৃহ আলোকিত। কোনও কালে এ জ্যোতি ম্লান হইবে না। আজিও হিন্দু সধবার 'সীতা' শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ, বিবাহ-গানে সীতা-সঙ্গীত, কন্যার মৃত্যুতে মাতার 'সীতা' নামে হৃদয়-

ভেদী ক্রন্দন,—আজিও ভারতের গগন-পবন, জলস্থল সীতা নামের সুধায় পরিপূরিত।

সীতার চরিত্র যেমন অপূর্ব্ব, জন্ম-বৃত্তান্তও তেমনি অলৌকিক। মাতৃগর্ভে তাঁহার জন্ম হয় নাই, জন্ম তাঁহার পৃথিবীর গর্ভে। মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনক স্বহস্তে পবিত্র যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ন্যায় একটি বালিকা প্রাপ্ত হন। লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার সময় যে গর্ত্ত হয় তাহার নাম 'সীতা'। লাঙ্গলের মুখে জন্ম বলিয়া জনক বালিকার নাম রাখিলেন সীতা। রাণীর উপর সীতার লালন-পালনের ভার পড়িল।

এখন সীতা রাজনন্দিনী। রাজ-অন্তঃপুরে মাতা-পিতার স্নেহ ও যত্নে তিনি লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। শরতের জ্যোৎস্নার মত জানকীর রূপ রাজভবন আলোকিত করিল। সীতা বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হইলে জনক তাঁহার স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। এই স্বয়ম্বর এক নূতন ধরণের। জনকের গৃহে এক প্রকাণ্ড শিব-ধনু ছিল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যিনি সেই ধনুতে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহার হস্তেই সীতারত্ন অর্পিত হইবে। দিক্‌দিগন্ত হইতে রাজগণ আসিয়া মিথিলায় সমবেত হইলেন। লঙ্কা-রাজ রাবণও স্বীয় শক্তির পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সেই শিবধনুতে জ্যা-যোজনা ত দূরের কথা, কেহই তাহা নাড়িতেও সক্ষম হইলেন না।

অবশেষে অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র আসিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। বালক যেমন করিয়া তাহার খেলিবার ধনুটি হাতে তুলিয়া লয়, রামচন্দ্রও তেমনি অনায়াসে সকলকে বিস্মিত করিয়া সেই বিশাল ধনুটি হাতে তুলিয়া লইলেন। তারপর তিনি যেমন জ্যা সংলগ্ন করিবার জন্য উহার একদিক্ নোয়াইয়া ধরিলেন, অমনি তাহা ভীষণ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। রাজর্ষি জনক সানন্দে সীতাকে রামচন্দ্রের করে সম্প্রদান করিলেন। পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া শ্বশুরগৃহ আলোকিত করিবার জন্য বধূবেশিনী সীতা স্বামীর সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন।

রঘুকুল-বধূ সীতা শ্বশুর শাশুড়ীর অগাধ স্নেহ, স্বামীর অতুল ভালবাসা, দেবর ও দেবর-পত্নীগণের অকৃত্রিম ভক্তি ও দাসীদিগের আন্তরিক সেবায় পরম সুখে ও শান্তিতে শ্বশুরগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সীতার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ হইল। অযোধ্যার রাজপুত্রবধূ সীতা, কিসের অভাব তাঁহার? জগতের কোনও দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অশান্তি ত দূরের কথা, সূর্য্যের কিরণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দাসীরা তাঁহার সামান্য একটি আদেশ প্রতিপালনের জন্য আকুল আগ্রহে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। স্বয়ং ঐশ্বর্য্য যেন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। অযোধ্যার সিংহাসন একদিন তাঁহার পবিত্র চরণ বক্ষে লইয়া ধন্য হওয়ার আশায় দিনপাত করিতেছে। কিন্তু এই

রাজ-সুখ সীতার অদৃষ্টে বেশীদিন স্থায়ী হইল না। অল্পদিন পরেই দুঃখের একটা নিবিড় অন্ধকার তাঁহার জীবনকে ঢাকিয়া ফেলিল।

রামচন্দ্র যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, রাজ্যের সমস্ত প্রজাবর্গ সেই উৎসবে মগ্ন। রাজপুরী আনন্দে পরিপূর্ণ। রাত্রি প্রভাত হইলেই রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু সহসা উৎসব-কোলাহল পরিপূর্ণ রাজভবন নিস্তব্ধ হইল, উৎসবের বাঁশী বাজিতে বাজিতে থামিয়া গেল, পুরবাসিগণের হাস্যপ্রফুল্ল মুখ মুহূর্ত্তমধ্যে শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। রামচন্দ্রকে পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে হইবে।

বনবাস-যাত্রার আয়োজন হইল। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের সহযাত্রী হইলেন। আর সীতা? তিনিও স্বামীর বনবাস-সঙ্গিনী হইবার প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, "দেব, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আপনি বিহনে এই রাজপুরী আমার নিকট ভীষণ বন অপেক্ষাও অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইবে, আমি আপনার সহধর্ম্মিণী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার কিছুতেই যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

পতিপ্রাণা পত্নীর কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "প্রিয়ে, তুমি জান না, বনবাসের কষ্ট কি ভয়ানক! বনে পদে পদে বিপদ্, পদে পদে মৃত্যুর আশঙ্কা। সিংহ,

ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। আমি তোমাকে কিরূপে সেখানে লইয়া যাইব? তুমি আজন্ম সুখের কোলে মানুষ হইয়াছ, বনে তিক্তকষায় ফলমূল খাইয়া দিনপাত করিতে হইবে, গাছের নীচে সামান্য পাতার কুটীরে কুশশয্যায় রাত্রি যাপন করিতে হইবে, সামান্য বাকল পরিয়া দুরন্ত শীত কাটাইতে হইবে, পায়ে হাঁটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইবে। তোমার এই কোমল শরীরে সে কষ্ট সহ্য হইবে না। এক দিনের কষ্টেই তুমি প্রাণত্যাগ করিবে। তাহা অপেক্ষা তুমি ঘরে থাকিয়া মাতাপিতার সেবা কর।"

স্বামীর কথায় সীতা যাহা উত্তর করিলেন তাহা এক-মাত্র সীতার মুখে,—আর্য্যনারীর মুখেই শোভা পায়। জগতে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সীতা কহিলেন, "দেব আপনি আমার গুরু, আপনি আমার দেবতা। আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম, আপনার পূজাই আমার ঈশ্বর-সেবা। আপনি ভিন্ন আমি কিছুই জানি না। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গতি নাই, স্ত্রী শুধু স্বামীর জীবনসঙ্গিনী নহে, মরণেও সঙ্গিনী,—বনবাস ত তুচ্ছ কথা। আপনার সঙ্গে থাকিলে বনবাসের কষ্টকে আমি রাজসুখ-ভোগ অপেক্ষা গৌরবের বলিয়া মনে করিব। আপনি পরশুরাম-বিজয়ী বীর, আপনি নানা শাস্ত্রে

সুপণ্ডিত, আপনার মুখে ঐ সব কথা শোভা পায় না। আপনার সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিবার সময় যদি আমার চরণে কুশ অথবা কণ্টক বিদ্ধ হয়, আমি তাহা হাসিমুখে সহ্য করিব। যদি গায়ে ধূলা লাগে, তবে আমার নিকট তাহা চন্দন বলিয়া মনে হইবে। আপনার সঙ্গে বৃক্ষতলে বাস করিয়া আমি তাহা রাজ-অট্টালিকা বলিয়া মনে করিব। বনে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলে আপনার মুখ দেখিয়া আমি তাহা ভুলিয়া যাইব। কিন্তু আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি আর প্রাণ রাখিব না।” সীতার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া রামচন্দ্র আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে সঙ্গে যাইবার অনুমতি দিলেন।

যে সীতা কখনও সূর্য্যের মুখ দর্শন করেন নাই, এক পা ভূমিও যাঁহাকে পদব্রজে যাইতে হয় নাই, নানা রত্নালঙ্কার যাঁহার দেহের শোভাবর্দ্ধন করিত, সেই রঘুকুলের রাজলক্ষ্মী সীতা আজ সামান্য একখণ্ড কাপড় পরিয়া এবং সধবার চিহ্নস্বরূপ সাধারণ অলঙ্কারমাত্র ধারণ করিয়া বনবাসের দুঃখ সহ্য করিবার জন্য স্বামী ও দেবরের সহিত সানন্দে নগ্নপদে ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রাজপথে চলিয়াছেন। পতিপ্রাণতার কি জ্বলন্ত মূর্ত্তি! অযোধ্যার অধিবাসীদিগের হৃদয় আজ সেই বনবাস-দৃশ্য দেখিয়া দুঃখে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, চক্ষু

জলে ভরিয়া আসিতেছে। পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আজ তাঁহাদের দুঃখে ম্রিয়মাণ।

রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতা আজ বনবাসিনী। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁহার সে বনবাস স্বর্গবাস অপেক্ষাও আনন্দের। বিরাট দণ্ডক বনের পঞ্চবটী নামক প্রান্তে গোদাবরী নদীর তীরে লতাপাতার একখানি কুটীর তাঁহাদের বাসগৃহ। বনের ফলমূল ও নদীর জল তাঁহাদের জীবন-ধারণের উপায়। সীতা এখানে যেন বনদেবী, পঞ্চবটীর প্রত্যেকটি গাছ প্রত্যেকটি লতা যেন কত আদরের। হরিণ-শিশুরা তাঁহার দৈনিক অতিথি; হাততালি দিয়া সীতা তাহাদের সঙ্গে নাচেন। বনের পাখীদের সুরে সুর মিলাইয়া তিনি গান গাহেন। বনের ফুল তুলিয়া স্বামীকে সাজান ও নিজে সাজেন। গোদাবরীর জলে রাজহংসীদের সহিত সাঁতার দেন। স্বামীর হাত ধরিয়া গোদাবরী-তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে বন-শোভা দর্শন করেন। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া যখন সীতা তাঁহার মুখে শাস্ত্রকথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার মনে হয়, এ সুখের কাছে রাজ-সুখ কোন্ ছার! রামচন্দ্র যখন বনফুল আনিয়া সীতাকে সাজাইয়া কৌতুকে বনদেবী বলিয়া ডাকেন, তখন সীতার মনে হয়, এই সম্ভাষণের কাছে সুধা-বর্ষণও বুঝি তুচ্ছ। সীতা যখন সকাল সন্ধ্যায় স্বামীর চরণ

সেবা করিতে বসেন, তখন তাহার মনে হয়, কৈলাসে বুঝি গৌরী এমনি করিয়া মহেশ্বরের পদপূজা করেন। ফলমূল ভোজন, বল্কল পরিধান, কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়াও জানকী পরম সৌন্দর্য্যশালিনী; শান্তি ও আনন্দে তিনি আত্মহারা। কিন্তু এই সুখশান্তি তাঁহার অদৃষ্টে চিরস্থায়ী হইল না। দুঃখের মেঘ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার সুখশান্তিকে ঢাকিয়া ফেলিল। এই দুঃখই সীতাকে সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া করিয়াছে, এই দুঃখের আগুনে পুড়িয়াই সীতার সতীত্ব-গৌরব জগতে চির-উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

লঙ্কা-রাজ রাবণ স্বীয় ভগিনী শূর্পণখার নিকট সীতার রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণমৃগের অনুসন্ধানে রাম লক্ষ্মণ যখন কুটীর হইতে দূরে গমন করিলেন, সেই সুযোগে পাপাত্মা রাবণ ঋষির বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার জন্য সীতার নিকট উপস্থিত হইল। অতিথি-সৎকার অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া সরলপ্রাণা সীতা যেমন ভিক্ষা-হস্তে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি পাপিষ্ঠ তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া লঙ্কার দিকে প্রস্থান করিল। সীতা মুক্তির জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাক্ষসের আসুরিক শক্তির নিকট নারী-শক্তি জয়ী হইতে পারিবে কেন? সীতা কত কাঁদিলেন, কত অনুনয়

বিনয় করিলেন, কিন্তু পাষাণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও গলিল না। তিনি 'হা, স্বামিন্, হা লক্ষ্মণ'! বলিয়া কত চীৎকার করিলেন। তাঁহারা তখন বহু দূরে, কাজেই সীতার ক্রন্দন তাঁহাদের কাণে পৌঁছিল না। উপায় না দেখিয়া অভাগিনী সীতা স্বর্গের দেবতা, বনের পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদিগকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত ডাকিলেন। প্রতিধ্বনি কেবল ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি নিজের গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিয়া পথে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—মনে আশা, রামচন্দ্র উহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার উদ্ধার-সাধন করিতে পারিবেন।

অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সীতা এখন রাক্ষসপুরীতে অশোকবনে বন্দিনী। চেড়ীগণের নির্য্যাতন, রাবণের প্রলোভন ও ভয়-প্রদর্শন কিছুই সীতাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, হৃদয়ে শুধু স্বামীর মূর্ত্তি-ধ্যান, মুখে কেবল 'হা রাম' শব্দ আর বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস। রাবণের পাপ প্রস্তাবে পতিব্রতার কি তেজোপূর্ণ উত্তর! "রে পাপিষ্ঠ! কুকুর যেমন গোপনে যজ্ঞের ঘৃত ভক্ষণ করে, তুইও তেমন কাপুরুষের মত রামলক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে ভিক্ষুকবেশে আমাকে চুরি করিয়া আনিয়াছিস্। এই পাপের ফলে তোকে সবংশে পুড়িয়া মরিতে হইবে। আমার স্বামী ও দেবর তোর সোনার লঙ্কা ভস্ম করিয়া আমাকে উদ্ধার

করিবেন।” স্বীয় সতীত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস বলেই সীতা সহায়হীনা হইয়াও শত্রুপুরীতে রাবণকে এই প্রকার কঠোর তিরস্কার করিতে পারিয়াছিলেন।

হনুমান্ বহুস্থানে সীতাকে অনুসন্ধান করিয়া শেষে লঙ্কায় অশোকবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পূর্ব্বে সীতাকে কখনও দেখে নাই। কেবল রামচন্দ্রের মুখে তাঁহার বর্ণনা শুনিয়াছে। অশোক-কাননের উচ্চ বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া সে দেখিতে পাইল, ভীষণ রাক্ষসীরা একজন সুন্দরী স্ত্রীলোককে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটির মাথায় বহুদিন তেল পড়ে নাই, শরীর শুষ্ক, মুখ বিষাদমাখা, চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা, মুখে ‘হা রাম, হা রাম’ শব্দ। হনুমান্ বুঝিতে পারিল, এই সেই রাম-প্রিয়া সীতা, যাঁহার জন্য এতদিন সে দেশদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। কিছুক্ষণ পরে চেড়ীরা সীতাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গেলে হনুমান্ গাছের ডালে বসিয়া ‘জয় রাম’ শব্দ করিল। সীতার কাণে তাঁহার সেই চির আদরের নাম প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উপরের দিকে চাহিলেন। হনুমান্‌কে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, হয় ত রাবণের কোনও মায়াবী দূত তাঁহাকে এইরূপে ছলনা করিতেছে। তথাপি রামনাম শুনিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি হনুমান্‌কে কহিলেন, “সত্য সত্যই যদি তুমি রাম-

চন্দ্রের অনুচর হইয়া থাক, তবে আমার বরে তুমি অমর হইবে।"

হনুমান্ কহিল, "মা, আমি সেই পিতৃসত্যপালনে বনবাসী রামচন্দ্রেরই অনুচর। বেশী দিন আপনাকে আর এই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। শীঘ্রই রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন।" এই বলিয়া হনুমান্ রামচন্দ্রের অঙ্গুরী সীতার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। স্বামীর অঙ্গুরী দেখিয়া সীতার সমস্ত দুঃখের অবসান হইল, যেন স্বামীকেই তিনি সাক্ষাতে পাইয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

হনুমান্ কহিল, "মা জানকি, আপনার দয়া হইলে এ দাস আপনাকে স্কন্ধে করিয়া এখনই আপনার স্বামীর নিকট লইয়া যাইতে পারে।"

সীতা উত্তর করিলেন, কুলস্ত্রী হইয়া আমি তোমার স্কন্ধে আরোহণ করিলে আমাকে স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষ-স্পর্শের পাপভাগিনী হইতে হইবে। আর রামচন্দ্র যদি লঙ্কায় আসিয়া যুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত বা নিহত করিয়া আমায় উদ্ধার করেন, তবে তাঁহার কীর্ত্তি ও বীরত্ব ত্রিভুবনে ঘোষিত হইবে।" স্বামীর জন্য সীতা ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট অত সহজে যাওয়ার সুযোগ পাইয়াও পতিপ্রাণা কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিলেন! স্বামীর গৌরব-বৃদ্ধির জন্য সতীর কি গভীর স্বার্থত্যাগ!

পর-পুরুষ-স্পর্শ অপেক্ষা রাক্ষসের হস্তে মৃত্যুও তাঁহার শ্রেয়ঃ। ধন্য সীতা, ধন্য তোমার পাতিব্রত্য!

রামচন্দ্র বানর-সৈন্য সাহায্যে সমুদ্রবন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিলেন। ভীষণ যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হইল। রাবণের ভ্রাতা এবং রামচন্দ্রের পরম বন্ধু বিভীষণ সীতাকে রামচন্দ্রের নিকটে লইয়া গেলেন। সীতার প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে বহু কষ্ট ভোগের পর তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন। পাল্কী হইতে নামিয়া সীতা কোনও দিকে না চাহিয়া কেবল স্বামীর চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র ধীর গম্ভীর বচনে কহিলেন, "সীতা, তোমার পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের লোকে হয় ত সন্দেহ করিতে পারে, তাহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তুমি কোনও অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন কর, আশীর্ব্বাদ করি সতীত্ব বলে যে কোনও পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে।"

সীতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার প্রাণে এতক্ষণ যে আনন্দের ফুল ফুটিয়া গন্ধ বিলাইতেছিল, তাহা একেবারে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। যে জন্য তিনি রাক্ষসের হাতে শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন, আজ রামচন্দ্রের কথায় তাহা শেষ হইয়া

গেল। আর কি জন্য তিনি জীবন ধারণ করিবেন? স্বামীর অবিশ্বাসিনী হইয়া প্রাণ রাখিয়া লাভ কি? কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হইলেন না, কেবল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন মাত্র। লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর, আমি চিতার আগুনে এই জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

সহস্র সহস্র জিহ্বা মেলিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল। সীতা স্বর্গের দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "যদি আমি কখনও চিন্তায়, বাক্যে বা কার্য্যে অসতী হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই আগুনে যেন আমি দগ্ধ হইয়া যাই। জন্মজন্মান্তরেও যেন আমি পাপের আগুনে দগ্ধ হই।" এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উপস্থিত লোকেরা স্তম্ভিত হইয়া চিতাকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। অল্পকাল পরেই অগ্নিমধ্য হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি সীতাকে কোলে লইয়া আবির্ভূতা হইলেন। সতীকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারিল না, সতীত্বের তেজে আগুনের তেজ হীন হইয়া গেল। সেই দেবীমূর্ত্তির কোলে সীতা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মূর্ত্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রাম, সীতাকে সামান্যা মানবী মনে করিও না, সীতা দেবী। মানব-রাজ্যের বহু ঊর্দ্ধে ইহার স্থান। সীতার

চরিত্রে কলঙ্কের লেশ মাত্র নাই, সে অগ্নির মত পবিত্র। তুমি নিঃসন্দেহ হইয়া ইহাকে গ্রহণ কর।"—এই বলিয়া সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন। সমবেত জনমণ্ডলীর সহস্র সহস্র মস্তক শ্রদ্ধায় সীতার চরণে প্রণত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জয় সীতারাম' শব্দ উঠিতে লাগিল।

রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। এখন সীতা রাজরাণী, স্বামীর অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসার অধিকারিণী। কিন্তু সীতা চিরদুঃখিনী। এ সুখ সীতার ভাগ্যে বেশীদিন রহিল না। স্বামীসুখ ভগবান্ সীতার অদৃষ্টে লেখেন নাই। তিনি দীর্ঘকাল লঙ্কায় বাস করায় প্রজাগণ তাঁহার পবিত্রতায় সন্দেহ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলেন, কিন্তু উপায় নাই। তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য সীতাকে বনবাসে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি স্বামী, এ কথা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে হইল; তাঁহাকে কেবল স্মরণ রাখিতে হইল, তিনি রাজা, প্রজার মনস্তুষ্টিই রাজার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সীতা তপোবন দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তপোবন দর্শন করাইবার ছলে তাঁহাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন। সীতা তখন গর্ভবতী। নির্দ্দিষ্ট দিনে সীতা লক্ষ্মণের সহিত রথে চড়িয়া তপোবন

দেখিতে চলিলেন। প্রাণ তাঁহার আনন্দে ভরপূর, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এ তাঁহার তপোবন দর্শনে যাত্রা নহে, এ চিরবিদায় গ্রহণ। তপোবনে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে রামচন্দ্রের সেই নিষ্ঠুর আদেশ শুনাইলেন। দুঃখে সীতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু স্বামীকে তিনি সে জন্য বিন্দুমাত্রও দোষী করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, দয়ার সাগর স্বামী তাঁহার নির্দ্দয় নহেন, এই শাস্তি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। সতী স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস হারাইলেন না। স্বামীর রাজধর্ম্ম যাহাতে কলঙ্কিত না হয়, ইহাই সীতার একমাত্র অন্তরের কামনা। স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও এক মুহূর্ত্তও তিনি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে বিরত হন নাই। এই অসীম ধৈর্য্য ও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা সীতাকে অতুলনীয়া করিয়া রাখিয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে তাঁহার তপোবনে রাখিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার লব ও কুশ নামে দুইটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদের মুখে হাসি দেখিয়া, তাহাদিগকে বুকে লইয়া দুঃখিনী সীতা বনবাসের দুঃখ ভুলিতে লাগিলেন। লব ও কুশ যে রাজপুত্র তাহা তাহারা জানিতে পারিল না। ঋষি-পুত্রদের মতই তাহাদের বেশভূষা ও শিক্ষাদীক্ষা। কিন্তু বাল্মীকি জানিতেন, একদিন তাহারা অযোধ্যার সিংহাসনে

বসিবেন, তাই তিনি তাহাদিগকে ক্ষত্রোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। বালক দুইটির কোমলকণ্ঠের সুমধুর বেদগানে যেমন তপোবন মুখরিত হইয়া উঠিত, তেমনি তাহাদের ধনুকের টঙ্কারে বনভূমি কম্পিত হইত। মহর্ষি তাহাদিগকে রামচরিত শিখাইয়াছিলেন, যখন তাহারা মায়ের সম্মুখে বসিয়া সুমিষ্ট কণ্ঠে রামায়ণ গান করিতেন, তখন সীতার হৃদয় স্বামীর গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তিনি মুগ্ধ হইয়া সেই গান শুনিতেন। তাঁহার মনে হইত তপোবনের প্রত্যেক বৃক্ষলতা হইতে যেন সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে। তথাপি সীতা দুঃখিনী, হৃদয় তাঁহার বেদনার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ। আমরা পঞ্চবটী বনে সীতাকে দেখিয়াছিলাম, মূর্ত্তিমতী আনন্দ-প্রতিমা, আর এই বাল্মীকির তপোবনের সীতা বিষাদে মলিন, দুঃখের কঙ্কাল মূর্ত্তি!

রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মপত্নীর সহিত একত্র হইয়া যাগযজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়। রামচন্দ্র স্বর্ণদ্বারা সীতার একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এই সংবাদে সীতার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। রামচন্দ্র যে এখনও তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীর গৌরবময় অধিকার দিতে কুণ্ঠিত নহেন, এই আনন্দ তাঁহার প্রাণে পরম শান্তি দান করিল। রামচন্দ্র যদি এখনও তাঁহাকেই ভালবাসেন, তবে তাঁহার এ বনবাসে দুঃখ কি?

বাল্মীকি যজ্ঞ-দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া লব ও কুশকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। বালকদ্বয় রাজ-সভায় বাল্মীকির শিক্ষা মত এমন সুন্দর ভাবে রামচরিত গান করিলেন যে, সে গানে সকলেই মুগ্ধ হইল। রামচন্দ্রের প্রাণও সীতার শোকে আকুল হইয়া উঠিল। বাল্মীকি তখন লব ও কুশের প্রকৃত পরিচয় দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বৎস রামচন্দ্র, তুমি সীতাকে আবার গ্রহণ কর। এই রাজসভায় আমি সকলের সম্মুখে বলিতেছি, সীতা পরম পবিত্র, তাঁহার চরিত্রে পাপের লেশ মাত্র নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "সীতার চরিত্রে আমার কোনও দিন ত সন্দেহ নাই। কেবল প্রজাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃসহ জীবনভার বহন করিতেছি। প্রজাগণের সম্মুখে তাঁহার পবিত্রতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

বাল্মীকি আনন্দিত মনে সীতার নিকট যাইয়া রামচন্দ্র যে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা কহিলেন; কিন্তু পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইবে তাহা প্রকাশ করিলেন না। প্রায় বার বৎসর পরে আবার সীতা স্বামীর চরণ দর্শন করিতে পাইবেন, এই আনন্দ ও সুখের সংবাদে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

পরদিন রাজসভা লোকে লোকারণ্য। রামচন্দ্র

সীতাকে আবার গ্রহণ করিবেন শুনিয়া দূর দূরান্তর হইতে লোকেরা তাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছে। ধীরে ধীরে মলিনবসনা সীতা অবনত মুখে আসিয়া সভায় দাঁড়াইলেন। স্বামীর সেই সুধামাখা আদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার হৃদয় আকুল। চারিদিক্ স্থির নিস্তব্ধ। বাল্মীকি সভায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র সীতাকে আবার গ্রহণ করিবেন, সীতা তোমাদিগের সম্মুখে তাঁহার পবিত্রতার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দান করিবেন।"

আবার পরীক্ষা! আঘাতের উপর আবার আঘাত! সীতা অকাতরে এতদিন সমস্ত দুঃখ সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর সহ্য হয় না। বারংবার পরীক্ষা-দান তাঁহার পক্ষে অপমানজনক। দুঃখে, অপমানে ও নিরাশায় সীতার ওষ্ঠ দুইখানি কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার পা যেন আর তাঁহার শীর্ণ শরীরকে ধরিয়া রাখিতে পারিতে-ছিল না। এই পাপ পৃথিবীতে আর এক মুহূর্ত্তও বাস তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি কাতর-কণ্ঠে পৃথিবীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, স্বামী ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও আমি মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিয়া থাকি, তবে জন্ম জন্মান্তর যেন আমি সেই পাপের ফল ভোগ করি। আর যদি আমি সতী হই, রামচন্দ্রই যদি আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হন, তবে মা, তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে আমাকে স্থান দাও। আমি তোমার বুকে আশ্রয়

লইয়া পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করি। আর যে আমি এই অপমান, দুঃখ, কষ্ট সহ্য করিতে পারি না মা! তুমি তোমার হতভাগিনী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পবিত্রতা প্রমাণ কর।"

সকলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া দেখিল,—সীতার কথা শেষ হইতে না হইতে পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া সীতাকে কোলে টানিয়া লইয়া আবার পৃথিবীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখের শেষ হইল। জগতে সতী-ধর্ম্মের এক উজ্জ্বল মাহাত্ম্য রাখিয়া সীতা আবার জননীর বুকে স্থান লাভ করিলেন।

সতী

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ বহু কন্যার পিতা। সতী তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা। স্ত্রীলোকের স্বামিসেবার জন্য যে 'সতী' নাম সৃষ্ট হইয়াছে, যে অলঙ্কার প্রত্যেক নারীর কামনার বস্তু, তাহা এই দক্ষ-কন্যা সতীর স্বামিভক্তি হইতে জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

দক্ষ তাঁহার প্রত্যেক কন্যাকেই উপযুক্ত জামাতৃ-হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রত্যেকেই বংশমর্য্যাদায় এবং অন্যান্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি কশ্যপ, ধর্ম্মরাজ যম, চন্দ্র, মহর্ষি অঙ্গিরা প্রত্যেক জামাতাই ধনে, মানে, যশে অতুলনীয়। কিন্তু সতী স্বেচ্ছায় চিরদরিদ্র শ্মশানবাসী মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তিনি স্বামীর আর্থিক বা লৌকিক বিভবে ভুলিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী; কিন্তু শিব ভিখারী, ঘরে একমুঠা অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহাকে সেই ভিখারীর স্ত্রী হইতে হইবে, তথাপি সতী মহেশ্বরকেই স্বামীরূপে বরণ করিলেন। পিতার আদেশ, জননীর মিনতি, ভগিনীগণের বিদ্রূপ, কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্প

ছাড়াইতে পারিল না। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য যাঁহার পদানত, সেই মহাদেবের আবার অন্য ঐশ্বর্য্যের আবশ্যকতা কি? দক্ষ স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে একমাত্র কন্যার অভিপ্রায় অনুসারেই মহাদেবের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ভিখারী শিবের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তাঁহার কুলমর্য্যাদায় বিষম আঘাত লাগিল। ঐশ্বর্য্যের কোমল ক্রোড়ে পালিতা আদরিণী কনিষ্ঠা কন্যার স্বেচ্ছায় এই দারিদ্র্য বরণে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শিবের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব আরও বাড়িয়া গেল। সতী যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করিতে পারেন, সেইজন্য দক্ষরাজ যথেষ্ট যৌতুক ও ধনরত্ন সহ তাঁহাকে স্বামিগৃহে কৈলাসে পাঠাইয়া দিলেন।

সতী কৈলাসে স্বামিগৃহে যাইয়া স্বামীর দারিদ্র্যের অংশভাগিনী হইলেন। স্বামীর প্রিয় বিল্বতল সতীরও প্রিয় বাসস্থান হইল, বহুমূল্য বসনভূষণ তাঁহার আর ভাল লাগিল না, তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিলেন। স্বামীর চরণ সেবাই জীবনের একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন। স্বামীর ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, স্বামীর সুখই তাঁহার সুখ, স্বামীর প্রিয় কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য হইল।

মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই যজ্ঞে সমস্ত দেবতা ও ঋষি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বিরাট সভামণ্ডপে তাঁহারা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। এমন সময় দক্ষরাজ

আসিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ছাড়া সকলেই দাঁড়াইয়া সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শিব জামাতা হইয়া শ্বশুরকে সম্মান দেখাইলেন না, ইহাতে দক্ষরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সভার মধ্যেই সকলের সম্মুখে তাঁহাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন। শিবের ভৃত্য নন্দী প্রভুর এই অপমান সহ্য করিতে পারিল না, সে দক্ষকে 'ছাগমুণ্ড হও' বলিয়া অভিশাপ দিল। দক্ষরাজ এই অপমান বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, কিসে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন তাহাই তাঁহার চিন্তা হইল। যাহাতে মহাদেব আর কোনও দেবসভায় নিমন্ত্রণ না পান সেজন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে নিজেই 'বাজ-পেয়' যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। দেবর্ষি নারদের উপর স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের সকলকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার পড়িল। দক্ষরাজ নারদকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, শিবকে যেন নিমন্ত্রণ করা না হয়। দক্ষের অন্যান্য কন্যারা পিতৃভবনে আনীতা হইলেন, কিন্তু সতী শিব-পত্নী বলিয়া পিতাকর্ত্তৃক অবজ্ঞাভরে পরিত্যক্তা হইলেন।

নারদ ঋষি চিরকালই বিবাদ বাঁধাইতে পটু। তিনি এই সংবাদ সতীকে জানাইয়া একটা অনর্থ সৃষ্টি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাপের বাড়ীর উৎসবে যাইতে না পারিলে স্ত্রীলোকের মন কেমন ব্যাকুল

হইয়া উঠে তাহা দেবর্ষি বেশ জানিতেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিতে করিতে পথে একবার কৈলাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিভুবন-ভ্রমণকারী নারদকে দেখিয়া সতী তাঁহার বাপের বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুযোগ পাইয়া সুচতুর নারদ কহিলেন, "সেখানে তাঁহারা সব ভাল আছেন। আমি সম্প্রতি সেখান হইতেই আসিতেছি। দক্ষ বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন, আমার উপর ত্রিভুবন নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছে। নিমন্ত্রণ করিতেই আমি বাহির হইয়াছি। আপনার ভগ্নীরাও সকলে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভাল আছেন। খুব বড় উৎসব মা, কিন্তু বড় দুঃখের কথা যে, এতবড় একটা ব্যাপারে দক্ষ আপনাদের নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

সতী বুঝিতে পারিলেন, পিতা রাগ করিয়াই তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। মন তাঁহার পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অত বড় উৎসব, ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত, তাঁহার ভগিনীরাও আসিয়াছেন, কেবল কি তিনিই এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, বহু দিবস পরে মাতাপিতাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তিনি স্বামীর নিকটে পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব কহিলেন, "বিনা নিমন্ত্রণে তোমার কি সেখানে যাওয়া সঙ্গত হয় সতী? ইচ্ছা করিয়াই তোমার পিতা

আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই, এই অবস্থায় যদি তুমি সেখানে যাও, তাহা হইলে আর আমার সম্মান থাকে না।"

সতী বলিলেন, "আমি মেয়ে, বাপমায়ের কাছে যাইব, ইহাতে আবার নিমন্ত্রণ কি? আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি না গেলে এই উৎসবে মা প্রাণে শান্তি পাইবেন না।"

শিব কহিলেন, "মাতাপিতার জন্য তোমার প্রাণে আকুলতা স্বাভাবিক। কিন্তু সতী, সেখানে গিয়া শতমুখে কেবল আমার নিন্দাই শুনিবে, তাহাতে প্রাণে তোমার দারুণ আঘাত লাগিবে। যেখানে ঘৃণা ও অবহেলা, বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যাইয়া অপমানিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই।"

সতীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। শিব তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। স্বামীর অনুমতি পাইয়া সতীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বৃষের পিঠে চড়িয়া নন্দীর সঙ্গে বাপের বাড়ী চলিলেন। তাঁহার কোনও সাজসজ্জা বা বসন-ভূষণের পারিপাট্য নাই। তিনি ভিখারীর স্ত্রী, ভিখারিণীর মতই সাদাসিধা ভাবে চলিয়াছেন। পথে কতই সুখের কল্পনায় তাঁহার হৃদয় বিভোর হইয়া উঠিল। বহু দিন পরে তিনি মাতাপিতার নিকট চলিয়াছেন; পিতৃগৃহ, জন্মভূমি,

শৈশবের প্রিয় লীলাস্থল যেন কতই স্নেহের আকর্ষণে তাঁহাকে টানিয়া লইতেছে। সতীর প্রাণ আজ আনন্দে ভরপূর, তাই তিনি চতুর্দ্দিক্ আনন্দময় দেখিতে লাগিলেন। নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, বন, আকাশ সবই যেন আনন্দে হাসিতেছে।

সতী আসিয়াছেন শুনিয়া জননী প্রসূতি ও ভগিনীরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে কতই আদরে ঘরে লইয়া গেলেন। বহুদিন পরে মায়ের বুকে সতী যেন আদরে গলিয়া পড়িলেন। ভগিনীদিগের হাবভাবে, কথাবার্ত্তায় ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সতী একটুও দুঃখিত হইলেন না; স্বামী তাঁহার গরীব, তাহাতেই তাঁহার সুখ ও তৃপ্তি।

পিতাকে প্রণাম করিবার জন্য সতী যজ্ঞস্থলে গেলেন। বহুদিন পরে কন্যার সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু দক্ষ কন্যাকে সেভাবে আদর করিলেন না, সামান্যভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন মাত্র। পিতার এই অনাদরে সতীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি রাগ ও অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, যজ্ঞে আপনার সমস্ত জামাতাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; কিন্তু মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেন নাই কেন? ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার পদধূলি পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করেন, ভিখারী বলিয়া আপনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন? আপনার এ কাজ

সঙ্গত হয় নাই, শিবের প্রতি আপনার এ অভিমান শোভা পায় না পিতা !”

দক্ষ কহিলেন, “শিবের যে আচরণ তাহাতে সে দেবতার সমাজে স্থান পাইতে পারে না। তাহার মাথায় জটা, কাঁধে সাপ, গায়ে ছাই, গলায় হাড়ের মালা, পরণে বাঘের ছাল, ভিক্ষা সম্বল, ভাঙ্গ ধুতূরা প্রিয় খাদ্য, শ্মশানে বাস, ভূতপ্রেত সঙ্গী। এই রকম অসভ্য জামাইকে কিরূপে আমি যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করি ? শিবের এই বর্ব্বরতার জন্য দেবতারা কেহই তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে চায় না। তোমার নিতান্ত মন্দ কপাল, সতী যে, এমন হতভাগ্য তোমার স্বামী। কি একটা অপদার্থের হাতেই তোমাকে আমি সঁপিয়া দিয়াছি। ভৃগুর যজ্ঞে শিব সমস্ত দেবতার সম্মুখে আমাকে যে অপমান করিয়াছে, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আবার এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া কি সকলের নিকট আমি অপমানিত হইব ? শিব আমার জামাই, এ পরিচয়ও আমার দিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়।”

পিতার মুখে স্বামি-নিন্দা শুনিয়া সতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট নরকের ন্যায় মনে হইতে লাগিল, যে আনন্দ বুকে লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন তাহাই যেন সাপের মত তাঁহার বুকে ছোবল মারিতে লাগিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে

বলিলেন, "পিতা, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আপনি মহেশ্বরকে চিনিতে পারিলেন না। ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যিনি শিবের পূজা না করেন। সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, শঙ্কর তাহা পান করিয়া পৃথিবী রক্ষা করিলেন, ত্রিপুরাসুরের অত্যাচারে যখন স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কাঁপিতেছিল ত্রিপুরারি তাহাকে ধ্বংস করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করেন। পিনাক যাহার ধনু, ব্রহ্মাবিষ্ণু যাঁহার পদধূলি কামনা করেন, যাঁহার বরে বিষ্ণু কমলাক্ষ হইলেন, সেই শিবকে আপনি জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন? আপনি পিতা, আমার গুরু, কিন্তু স্বামীর তুল্য স্ত্রীলোকের আর শ্রেষ্ঠ গুরু নাই। যে স্থানে স্বামীর নিন্দা হয়, তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। এই কাণে আমি স্বামি-নিন্দা শুনিয়াছি, সুতরাং এ পাপ দেহ আর রাখিব না, এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিব।" এই বলিয়া সতী সেইস্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; তাঁহার প্রাণহীন অসাড় দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

নন্দী তাড়াতাড়ি কৈলাসে ছুটিয়া গিয়া মহাদেবকে সতীর দেহত্যাগের সংবাদ দিলেন। সতী আর ইহলোকে নাই শুনিয়া মহাদেব শোকে পাগল হইলেন, তিনি রাগে নিজের জটা ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিবামাত্র এক ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি হইল, তাহার নাম বীরভদ্র। মহাদেব এই বীরভদ্রকে দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার

করিতে বলিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র বীরভদ্র শিবের অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া দক্ষ-গৃহে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞ লণ্ড-ভণ্ড করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিলেন।

মহাদেব সতীর শোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, সতীশূন্য কৈলাস আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি পাগল হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিবের এই উন্মত্তভাব দেখিয়া নারায়ণ তাঁহার সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহের অংশ পড়িয়াছিল, তাহা এক একটি বিশেষ পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। কত যুগ-যুগান্ত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই পীঠস্থানসমূহ আজিও ভারতের পুণ্যক্ষেত্ররূপে সতীর অলৌকিক পতিভক্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে। আজিও কোটি কোটি ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সেই সকল তীর্থভূমি দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতেছে।

মহাদেব সতীহারা হইয়া আর কৈলাসে ফিরিলেন না; হিমালয়ের এক অতি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের গৃহে রাণী মেনকার গর্ভে সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা হিমালয় কন্যার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন গৌরী। গৌরী সত্য সত্যই গৌরী, তাঁহার রূপের

জ্যোতিতে চন্দ্রের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়, বিদ্যুৎ লজ্জায় মাথা অবনত করে। জনকজননী কন্যার এত রূপ দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, এমন মেয়ের যোগ্য বর কোথায় পাইবেন ?

একদিন নারদ ঋষি ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া হিমালয়ের ঘরে উপস্থিত হইলেন। ত্রিভুবনে নারদের কিছু অজানা নাই। হিমালয়কে কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত দেখিয়া তিনি কহিলেন,—"গৌরীর বিবাহের জন্য চিন্তা করিও না, স্বয়ং মহাদেব ইহাকে বিবাহ করিবেন।"

মহাদেব তখন হিমালয়ের বাড়ীর নিকটে গঙ্গার তীরে তপস্যা করিতেছিলেন। হিমালয় বহু স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—গৌরী প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিবেন। মহাদেব স্বীকৃত হইলেন। তদবধি গৌরী প্রত্যহ খুব ভক্তির সহিত শিবপূজা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবতারা মহাদেবকে আবার বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তপস্যার জন্য অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। গৌরীর শিব-পূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। ইহাতে তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। গৌরী মনে মনে শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, যত কঠিন তপস্যাই করিতে হউক না কেন, তিনি তাহাতেই শিবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী হইবেন,—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল।

গৌরী তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে কি ভীষণ তপস্যা! গ্রীষ্মকালে চরিদিকে আগুন জ্বালিয়া, শীতকালে জলে ডুবিয়া, বর্ষাকালে বৃষ্টিধারা মাথা পাতিয়া লইয়া, অনাহারে, অনিদ্রায় বৎসরের পর বৎসর তিনি মহাদেবের জন্য তপস্যা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই কঠোর তপস্যা নিষ্ফল হইল না। অবশেষে মহাদেব একদিন ব্রাহ্মণ-বেশে আসিয়া গৌরীকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথায় তুমি সেই ভিখারী বৃদ্ধ শিবকে পাইবার জন্য এমন করিয়া তপস্যা করিতেছ? ভিক্ষুকের স্ত্রী হইয়া লাভ কি? তাঁহার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব নাই, শ্মশানে মশানে পড়িয়া থাকেন, ভূতপ্রেত সঙ্গে লইয়া ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়ান। গায়ে ভস্ম মাখা, গলায় হাড়ের মালা, মাথায় জটা, এমন অসভ্যকে কোন্ সুখের আশায় স্বামী রূপে কামনা করিতেছ?"

গৌরী উত্তর করিলেন, "যাঁহার মৃত্যু নাই, ব্রহ্মাবিষ্ণু যাঁহার তপস্যা করেন, এই ত্রিভুবন যাঁহার ঐশ্বর্য্য, যিনি মঙ্গলময়, কে তাঁহাকে স্বামী রূপে না চায়?"

ব্রাহ্মণ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। শিব-নিন্দা শুনিতে হইবে বলিয়া গৌরী সেস্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যাঁহাকে পাইবার

জন্য গৌরী এত কাল কঠোর তপস্যা করিতেছেন, সেই দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিব।"

তারপর একদিন হিমালয়ের গৃহে উৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পুরস্ত্রীগণের উলু ও শঙ্খধ্বনিতে ভবন মুখরিত হইল। হিমালয় গৌরীকে শিবের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সতী আবার গৌরীরূপে তাঁহার স্বামীকে পাইয়া ধন্য হইলেন।

অরুন্ধতী

কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সতী অরুন্ধতী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন; কিন্তু আজিও তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার নাম উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। পতিভক্তির জন্য তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে স্থান পাইয়াছেন। আজিও হিন্দুদিগের বিবাহের সময় ভক্তির সহিত পতিব্রতা অরুন্ধতীর নাম উচ্চারিত হয়। স্বামী কুশণ্ডিকার সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া যে মন্ত্রপাঠ করেন তাহার অর্থ—'পতিপ্রাণা অরুন্ধতী যেমন মহর্ষি বশিষ্ঠের একান্ত অনুরাগিনী, তুমিও সতী, আমাতে সেইরূপ অনুরাগিনী হও।' বালিকাগণ ভাগবত ব্রতের সময় অরুন্ধতীর মত পতিব্রতা হওয়ার বর প্রার্থনা করিয়া থাকে।

উত্তর আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের নীচেই সপ্তর্ষিমণ্ডল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রুত ও বশিষ্ঠ এই সাত ঋষি নিজ নিজ পুণ্য বলে সাতটী নক্ষত্র হইয়া ঊর্দ্ধ লোকে স্থান পাইয়াছেন। এই সাতটী নক্ষত্রকে এক সঙ্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। আকাশে মেঘ না থাকিলে এই

সপ্তর্ষিমণ্ডল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মধ্যে, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই মহর্ষি বশিষ্ঠের চিরসঙ্গিনী পত্নী অরুন্ধতী। দীর্ঘ-কাল স্বামি-সহবাসে পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরে ইনি স্বামীর সহিত নক্ষত্রলোকে গমন করিয়াছেন। এখনও সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের সহিত উদিত হইয়া অরুন্ধতী হিন্দুনারীর হৃদয়ে এক অতুলনীয় আদর্শের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাতিব্রত্যের ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কুললক্ষ্মীগণের প্রাণ সতীত্ব-মহিমায় ভরিয়া উঠে। সতী সাধ্বী নারীগণ মৃত্যুর পরে ঐ অরুন্ধতী-লোকে স্থান লাভ করেন।

সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানসকন্যা। লোহিত-সরোবরের তীরে চন্দ্রভাগা পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রান্তে তিনি কঠোর তপস্যা করিতেন। অনাহারে অনিদ্রায় বহুবৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু তবু তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর দেখা পাইলেন না। তাঁহারও প্রতিজ্ঞা হইল, যতদিনে যত কঠোর তপস্যা করিয়াই হউক, তিনি বিষ্ণুর দর্শন লাভ করিবেন। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায় তাঁহার শরীর শুষ্ক হইয়া কয়েকখানি হাড় মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দেবতারা দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তবু বিষ্ণুর দয়া হইল না। বিষ্ণুর দেখা না পাওয়ার কারণ,—সন্ধ্যা

তখনও কোনও গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। দীক্ষা না লইলে অন্তর পবিত্র হয় না, অন্তর পবিত্র না হইলে তপস্যা, আরাধনা, যাগযজ্ঞ সমস্তই বিফল হয়। যিনি যত বড় ঋষি বা মুনিই হউন না কেন, তাঁহাকে প্রথমে গুরুর নিকট দীক্ষা লইতেই হইবে। দীক্ষা না লওয়ায় সন্ধ্যারও তপস্যায় কোনও সুফল হইল না। অবশেষে ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে সন্ধ্যার নিকট পাঠাইলেন তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। বশিষ্ঠের নিকট দীক্ষা পাইয়া সন্ধ্যার অন্তর পবিত্র হইল, হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়া গেল। এইবার বিষ্ণু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে সন্ধ্যার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন।

সন্ধ্যা কহিলেন, "আপনি যদি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দান করুন যেন আমি আমার স্বামীর একান্ত অনুরক্তা স্ত্রী হইতে পারি, স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের প্রতি ভুলেও চাহিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি যেন আমার না হয়।" সন্ধ্যা ধন, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, সুখশান্তি, আয়ু কিছুই চাহিলেন না, এত কঠোর তপস্যা করিয়া চাহিলেন মাত্র পাতিব্রত্য-বর,—যাহা নারী-জীবনের একমাত্র প্রার্থনার সামগ্রী।

বিষ্ণু বলিলেন, "সন্ধ্যা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি পৃথিবীতে সতী-ধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া অবশেষে

স্বামীর সহিত নক্ষত্রলোকে স্থান পাইবে। মৃত্যুর পরেও স্বামীর সঙ্গ ছাড়া হইবে না। কিন্তু এ জন্মে নয়, শীঘ্রই তোমাকে মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মেধাতিথির আশ্রম। অতি সুন্দর তপোবন। গাছে গাছে, লতায় লতায় ফুল, গন্ধে বনভূমি আমোদিত; কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীর গান; ময়ূরের নৃত্য; হরিণের ক্রীড়া; তাপস বালিকাগণের মধুর হাসিভরা মুখে হরিণশিশুর সহিত খেলা; মুনিদিগের কণ্ঠে মধুর সামগান; হিংসাদ্বেষ, ঝগড়াবিবাদ, কোলাহল নাই;—যেন একটি পরম শান্তির রাজ্য। মেধাতিথি এই তপোবনে থাকিয়া তপস্যা করেন। তিনি পৃথিবীর উপকারের জন্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। সেই বিরাট যজ্ঞে দেবগণ এবং নানাস্থান হইতে ঋষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। দেবতা ও ঋষিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। মেধাতিথির শিষ্যগণ যজ্ঞ-বেদী হইতে ভস্ম সরাইয়া ফেলিবার সময় ভস্মমধ্যে এক অতি রূপ-লাবণ্যবতী শিশুকন্যা দেখিতে পাইয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতি সুন্দরী কন্যা; চাঁদের জ্যোৎস্নার মত রূপ; মাথায় কাল মেঘের মত একরাশ চুল; মুখে ঢল

ঢল হাসি ; গায়ে যেন শেফালী, মল্লিকা, পদ্ম, বকুল প্রভৃতি ফুলের গন্ধ ; ফুলের কুঁড়ির মত হাত পা, যেন মাখন ছানিয়া তৈয়ারী। ঋষি মেধাতিথিও এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী হইল,—"ইনি ব্রহ্মার মানস-কন্যা সন্ধ্যা, পৃথিবীতে পুণ্য-কার্য্য সম্পাদনের জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলেন, তুমি ইঁহাকে নিজের সন্তানের মত পালন করিও।" মেধাতিথি কন্যাটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন, পিতৃস্নেহে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন, অরুন্ধতী।

মেধাতিথির আশ্রমে তাঁহার স্নেহ ভালবাসায় অরুন্ধতী প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য বাড়িতে লাগিল, তাঁহার রূপের ছটায় তপোবন আলোকিত হইয়া উঠিল। অরুন্ধতী এখন যেন একটি বালিকা বনদেবী। মেধাতিথি সুশিক্ষিতা মুনি-পত্নীদিগের হস্তে বালিকার শিক্ষার ভার প্রদান করিলেন। তাঁহাদের নিকট বালিকা স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী সর্ব্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সাতবৎসর তিনি শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহার রূপ ও শিক্ষার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

অরুন্ধতী এখন আর বালিকা নাই, তিনি এখন যুবতী ; যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার সমস্ত দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন দেখিলে তাঁহাকে পৃথিবীর রক্তমাংসে

গড়া মানুষ বলিয়া মনে হয় না, তিনি যেন আলোক-রাজ্যের এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী-প্রতিমা। হৃদয়ও তাঁহার জ্ঞানে, দয়ায়, ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। এমন সময় একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠ আসিয়া মেধাতিথির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। বশিষ্ঠ তখন যুবক, সুন্দর, সুশ্রী পুরুষ, দেবকন্যাগণের কামনার সামগ্রী।

অরুন্ধতী তাঁহার এই মানসিক পরিবর্ত্তনে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন। একজন পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার এই ভাবান্তর কেন? কেন তাঁহার মন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল? এই কি তাঁহার শিক্ষা? এই কি তাঁহার ধর্ম্ম? তিনি নিজে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অনুতাপে তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর নিকট অকপটে সমস্ত কথা বলিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলেন। এইবার তাঁহার হৃদয় যেন অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গেল।

ঋষি-পত্নী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "অরুন্ধতি, যাঁহাকে আজ তুমি দেখিয়াছ, তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠ; জ্ঞানে, ধর্ম্মে তিনি অদ্বিতীয়। তোমার পূর্ব্ব জন্মে ইনিই তোমায় দীক্ষা দেন, ইঁহার দীক্ষাতেই তোমার অন্তর পবিত্র হইয়া বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভ হয়। এ জন্মে তোমার সেই সব কথা কিছুই মনে নাই। এখন স্মরণ করিয়া দেখ সমস্তই

স্পষ্ট মনে পড়িবে। ইনিই তোমার স্বামী হইবেন, ব্রহ্মার তাহাই ইচ্ছা, সেই জন্যই তিনি মহর্ষিকে আজ এখানে পাঠাইয়াছেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তোমার মনের ঐরূপ ভাবান্তর হইয়াছে ; ইহাতে তোমার অধর্ম্ম কিছুই হয় নাই। এই জন্য দুঃখিত হইও না। এই স্বামিসেবা করিয়াই তুমি অক্ষয়লোক লাভ করিবে।” এইবার অরুন্ধতীর পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা মনে পড়িল। বশিষ্ঠ তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিল। তিনি সেই দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, যে দিন তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব বশিষ্ঠের চরণে অর্পণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া যাইবেন,—যে দিন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বশিষ্ঠকে বিলাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে একদেহ একপ্রাণ হইয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

মেধাতিথি শুভদিনে বশিষ্ঠের করে কন্যা অরুন্ধতীকে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতারা বিবাহ দেখিতে মেধাতিথির তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অরুন্ধতী বিবাহ-সভায় মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আপনার সেবা, আপনার সন্তুষ্টি বিধান ব্যতীত যেন নিজের জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য না থাকে, ছায়ার ন্যায় যেন আপনার সহচারিণী হইতে পারি ; আপনার দেহ ও প্রাণ যেন আমারও দেহপ্রাণ হয়।” জীবনের একদিন এক মুহূর্ত্তও

তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালনে অবহেলা করেন নাই ; নদী যেমন সাগরের বুকে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে, অরুন্ধতীও তেমনই নিজেকে বশিষ্ঠের মধ্যে হারাইয়া ফেলিলেন। স্বামিসেবাই তাঁহার জপতপ ধ্যানজ্ঞান হইল। এইরূপে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পরম সুখে স্বামি-সহবাসে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন অগ্নি-পত্নী স্বাহা স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্য সপ্তর্ষি-স্ত্রীগণের রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। একে একে ছয়জনের রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু সতী-শিরোমণি অরুন্ধতীর রূপ ধারণে সমর্থ হইলেন না। তখন স্বাহা অরুন্ধতীকে স্তব করিয়া কহিলেন, "সাধ্বি, আপনিই ধন্য ! আপনিই একমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বিনী। যে সকল স্ত্রীলোক বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সম্মুখে স্বামীর হস্তস্পর্শ করিয়া একমাত্র আপনাকে স্মরণ করে, তাহাদের সুখ, ধন ও পুত্রলাভ হয় এবং তাহারা কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে না।"

একদিন মহাদেব নানা প্রকারে দেবী অরুন্ধতীর পতি-পরায়ণতা পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু কোনও প্রকার দোষ দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, "দেবি ! আমি তোমার ব্যবহারে পরম সুখী হইয়াছি, তুমি সৌভাগ্য লাভ কর। আমার বরে তোমার বৃদ্ধ স্বামী পুনরায় সুস্থশরীর, যৌবন, সৌন্দর্য্য এবং দেবতাদিগের ন্যায় অমরত্ব লাভ করুন।"

অরুন্ধতীর ক্ষমাগুণের তুলনা হয় না। বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধে যখন তাঁহার সাত পুত্রের মৃত্যু হইল, তখন অরুন্ধতী শোকে অধীর হইলেন সত্য; কিন্তু বিশ্বামিত্রকে কোনও প্রকার অভিসম্পাত করিলেন না; পুত্র-শোকাতুরা মাতা পুত্রঘাতীকে ক্ষমা করিলেন। এই ক্ষমাগুণ দেখিয়া বিশ্বামিত্র স্বয়ং স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

হিংসাদ্বেষ-জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আবার অরুন্ধতীর আদর্শ ফুটিয়া উঠুক। বাঙ্গালীর সংসার আবার শান্তি-নিকেতন হউক।

গার্গী

গার্গী—ইনি মহর্ষি গর্গের কন্যা। ইঁহার ন্যায় বিদুষী ও প্রতিভাসম্পন্না অতি অল্প স্ত্রীলোকই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার জ্ঞানে, বিদ্যায় ও প্রতিভায় ভারত গৌরবান্বিত।

বাল্যকাল হইতেই গার্গী চিন্তাশীলা। অন্যান্য বালিকাগণের ন্যায় তাঁহার শিশুকাল খেলাধূলায় কাটিয়া যায় নাই। তিনি বসিয়া বসিয়া এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতেন, ভাবিতে ভাবিতে এই পৃথিবী যাঁহার হাতের সৃষ্টি তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ আকাশ, ঐ মেঘ, ঐ চাঁদ, ঐ তারার মালা, কত সুন্দর ইহারা! লতায় লতায় কেমন ফুল ফোটে, বাতাস কেমন শরীর শীতল করিয়া বহিয়া যায়, পাখীরা কেমন সুন্দর গান গায়, ভোরের বেলায় সবুজ পাতায় পাতায় মুক্তার মতন কেমন শিশির দোলে, কি সুন্দর এই পৃথিবীখানি! কে এই পৃথিবী রচনা করিয়াছেন? না জানি তিনি কত সুন্দর, কত দয়ালু! কে তিনি? কোথায় থাকেন তিনি? তাঁহাকে কি দেখা যায় না? বালিকা একাকিনী বসিয়া

ইহাই ভাবিতেন, এই চিন্তাই ছিল তাঁহার খেলাধূলা। যাহাকে পাইতেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "তিনি কে, যিনি এই পৃথিবী এত সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছেন?" ঋষিরা উত্তর করিতেন, "তিনি ঈশ্বর, তাঁহাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, মনে কল্পনা করা যায় না, তবে যে তাঁহাকে ভালবাসে তিনিও তাহাকে ভালবাসেন।"

বালিকা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে লাগিলেন। যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা যায়, তাহাকে দেখিবার জন্যও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, দেখা না পাইলে মন প্রবোধ মানে না। বালিকার মনও ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই ভালবাসার ধনকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মহর্ষি গর্গ একজন মহাজ্ঞানী। ঋষি-সমাজে তাঁহার অতি উচ্চ সম্মান। গার্গী এই পিতার নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পিতা কন্যার এই প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। গর্গের শিষ্যেরা অনেক সময় অনেক তর্কে বালিকা গার্গীর নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন। তখনই সকলে বুঝিতে পারিলেন, এই বালিকা কালে অশেষ কীর্ত্তিশালিনী হইবেন।

গার্গী এখন আর বালিকা নাই। তিনি এখন কৈশোর ও যৌবনের মধ্য-পথে উপস্থিত। হৃদয় তাঁহার একজনের প্রেমে পরিপূর্ণ, তিনি এই অনন্ত বিশ্বের সম্রাট্। তাঁহাকে

পাইবার জন্য হৃদয় তাঁহার পাগল। পৃথিবীর রক্তমাংসে গঠিত স্বামী তিনি চাহেন না। তিনি চাহেন, একমাত্র তাঁহাকে, যিনি এই বিশ্বসংসারের কর্ত্তা। তাঁহাকেই তিনি দেহমন সমর্পণ করিলেন।

শরতের জ্যোৎস্না রাত্রি। চন্দ্রকিরণে সমস্ত তপোবন হাসিতেছে, দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া যাওয়ায় আকাশের শোভা যেন আরও বাড়িয়াছে। গার্গী করযোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। হৃদয়ের আবেগে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে দেবতা, হে জগতের স্বামী, তোমাকে কখনও আমি দেখি নাই, তবু বুঝিয়াছি, কত সুন্দর তুমি, কত দয়া তোমার! তোমাকে আমি জানি না, তবু এ হৃদয় তোমাকেই চায়। তোমাতে আমি আত্মহারা। তুমি কোথায়? কোথায় গেলে তোমাকে পাওয়া যায়? হে প্রাণের প্রাণ, হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আর লুকাইয়া থাকিও না, আমাকে দেখা দাও, আমার সম্মুখে তোমার ঐ ভুবনভুলান মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার চরণে অর্পণ করিয়া আমি ধন্য হই। এই হৃদয় তোমার, এই দেহ তোমার, আমি যে তোমাতে হারাইয়া গিয়াছি প্রভো, তুমি দেখা দাও,—দেখা দাও,—দেখা দাও,—"

সখী মৈত্রেয়ী আসিয়া গার্গীর এই ভাব দেখিয়া হাসিয়া

কহিলেন, "সখি, ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ ? শুনি, কে সেই ভাগ্যবান্ ? কে তোমাকে এমন করিয়া পাগল করিল ?"

গার্গী কহিলেন, "সত্যই সখি, আমি ভালবাসিয়াছি, আমি পাগল হইয়াছি। তিনি এই পৃথিবীর রাজা। তাঁহাকে না পাইলে যে আর প্রাণ তৃপ্তি লাভ করিতেছে না।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "তবেই মরিয়াছ। তিনি ত বাহিরের জিনিষ নহেন সখি, তিনি অন্তরের সামগ্রী, তাঁহাকে তোমার বুকের নীচে প্রাণের মধ্যে ধরিতে চেষ্টা কর, সেইখানেই তাঁহার সহিত তোমার মিলন হইবে।"

গার্গী মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রাণের আকুলতা শান্ত হইয়া আসিল, যাঁহার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই যেন হৃদয় ভরিয়া পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, তাঁহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইল। তিনি হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভগবানের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া শান্ত হইলেন।

পরকাল কি ? আত্মা কি ? মৃত্যুর পর আত্মার কি অবস্থা হয় ? ইত্যাদি গভীর বিষয় গার্গী চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুদিন তিনি এই আলোচনায় কাটাইলেন। সখী মৈত্রেয়ীর সহিত এই বিষয়ে অনেক আলোচনা এবং তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন

না। অবশেষে কোনও মহাপুরুষের নিকট যাইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সে সময় রাজর্ষি জনক, ঋষি এবং পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া এক সভা করিয়াছিলেন, প্রত্যহ সেই সভায় শাস্ত্রসম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক ও বিচার হইত। গার্গী মৈত্রেয়ীকে লইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন।

বিরাট সভা। সিংহাসনে রাজর্ষি জনক বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকটেই স্ত্রীলোকদিগের বসিবার আসন। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, তখন স্ত্রীলোকেরাও সভায় যোগদান করিতেন, সমাজে অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। গার্গী এবং মৈত্রেয়ী যাইয়া সে স্থানে বসিলেন। চতুর্দ্দিকে ঋষি এবং পণ্ডিতগণ উপবিষ্ট, সকলেই বিচারে জয়লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। অদূরে স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট একদল গাভী বাঁধা রহিয়াছে। রাজর্ষি জনক উপস্থিত ঋষি এবং পণ্ডিতদিগকে বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি ঈশ্বর কি তাহা জানেন, এই গাভীগুলি তাঁহারই।" জনকের এই কথা শুনিয়া একজন যুবক ঋষি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "হে রাজর্ষি, তবে এই গাভীগুলি আমার।" ইঁহার নাম যাজ্ঞবল্ক্য। ইনি একজন অতি সুপণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিয়া গার্গী উঠিয়া বলিলেন, "আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে, আগে তাহার উত্তর দিন, তারপর

গাভীগুলি লইবেন।” সভাস্থ সকলে অবাক্ হইলেন। এ রমণী কে? যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী ব্যতীত আর কি? কত জ্ঞান, কত বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে তবে যাজ্ঞবল্ক্যের মত জ্ঞানী ঋষিকে প্রশ্ন করা সম্ভবপর? গার্গী এক একটি করিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অতি কঠিন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া বিচার চলিল। ভারতে এমন একদিন ছিল, যখন বিদুষী মহিলাগণ রাজ-সভায় দাঁড়াইয়া ভগবান্ সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। এমন একদিন ছিল, যখন কোনও কোনও মহিলার নিকট ঋষি ও পণ্ডিতগণ বিচারে পরাজিত হইতেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যেরা গাভীগুলি আশ্রমে লইয়া গেলেন দেখিয়া ঋষিরা হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহাদের ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ হইল। তখন গার্গী দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “ঋষিগণ, আপনারা বিবাদ করিবেন না, আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে আরও দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন, তবে জানিবেন, আপনাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।”

গার্গী আবার প্রশ্ন করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন। ঋষিরা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সে সব তত্ত্বকথা তাঁহারা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, স্ত্রীলোক হইয়া

গার্গী অনায়াসে সেই সব তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন! গার্গী তখন ঋষিদিগকে বলিলেন, "আপনারা অনর্থক দুরাশা করিবেন না, যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের কাহারও নাই।" এককালে ভারতের আর্য্য-নারী জ্ঞানে ও বিদ্যায় কত উন্নত ছিলেন, বর্ত্তমান যুগে সে কথা স্বপ্নের মত মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। আজ তাঁহারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছেন, জানি না আবার ভারতে সে দিন ফিরিয়া আসিবে কি না। ভারতের গৃহলক্ষ্মীরা আবার পূর্ব্বের ন্যায়, শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানে ও গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিবেন কি না।

তারপর যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মৈত্রেয়ীর বিবাহ হইয়া গেল। গার্গী যেই উদাসীনা সেই উদাসীনাই রহিলেন। মৈত্রেয়ী একদিন গার্গীকে বলিলেন, "গার্গী, তুমি বিবাহ কর, যাজ্ঞবল্ক্যের মত স্বামী পাইলে তুমি সুখী হইতে পারিবে।"

গার্গী কহিলেন, "বিবাহ ত আমার হইয়া গিয়াছে সখি, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বামী জগতে আর কাহার আছে? যিনি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, জন্মমৃত্যু যাঁহার আদেশে ঘটে, চন্দ্রসূর্য্য যাঁহার আজ্ঞায় কিরণ দেয়, সেই ভগবান্ আমার স্বামী।"

গার্গী এখন রীতিমত সন্ন্যাসিনী, তাঁহার বেশভূষার আড়ম্বর নাই, পরিধানে গাছের ছাল, মাথায় অমন সুন্দর

চুল জটা হইয়া গিয়াছে, শরীরে তেল নাই, কিন্তু রূপ তাঁহার কমে নাই, আরও যেন বাড়িয়াছে। তপোবনের এক ধারে তিনি তপস্যায় নিযুক্তা। আকুলচিত্তে হৃদয়-স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন। গার্গীর রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেক ঋষি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কেহ কেহ আসিয়া তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিলেন, কিন্তু গার্গীর এক উত্তর, "আমি ব্রহ্মপত্নী, সেই পরমেশ্বরই আমার স্বামী।"

একদিন শ্বেতকেতু নামক এক ঋষি গার্গীর রূপে মুগ্ধ হইয়া আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "গার্গি, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হও, আমি তোমার শিষ্য হইয়া তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিব।"

গার্গী বলিলেন, "আমি যাঁহার সহধর্ম্মিণী তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আমি নিজেই ব্রহ্মজ্ঞান কিছু জানি না, তোমাকে কি শিক্ষা দিব? যদি ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে চাও, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যাও।"

এইরূপে কত ঋষি তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিল, কিন্তু গার্গী সকলকেই পরাস্ত করিয়া বিদায় দিলেন। ভগবানের চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, স্বামিন্! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বল দাও, এই সব পাপিষ্ঠের হাত হইতে আমাকে বাঁচাও। তুমি নিজে আসিয়া দেখা দিয়া আমার প্রাণ শীতল কর। তুমিই যে আমার সব, হৃদয়েশ্বর!"

একদিন গার্গী নির্জ্জনে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন, এমন সময় এক দুরাত্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "গার্গি, আমাকে তুমি বিবাহ কর।"

গার্গী বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বিবাহিতা, স্বয়ং ভগবান্ আমার স্বামী।"

দুর্ব্বৃত্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "আমি জোর করিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করে ?"

গার্গী নিরুপায় হইয়া আকুলকণ্ঠে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। এই সময় যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাহুবলের নিকট পরাস্ত হইয়া দুষ্ট পলায়ন করিল। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "গার্গি, দেখিলে ত অসহায় অবস্থা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কত বিপদের। আমি তোমাকে একটি অনুরোধ করিব। রাখিবে কি ?"

গার্গী বলিলেন, "আপনি কি অনুরোধ করিবেন বুঝিয়াছি; কিন্তু আপনি ত জানেন, এই হৃদয়, মন, আত্মা, দেহ, যৌবন, জীবন আমি সমস্তই একজনকে অর্পণ করিয়াছি। তিনিই আমার স্বামী, আমি অসহায়া কিসে ? প্রকৃতপক্ষে তিনিই ত আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন, আপনি নিমিত্ত মাত্র। চলুন, আমি আপনার আশ্রমে থাকিব।"

বাল্মীকির তপোবনে সীতার সহিত গার্গীর সাক্ষাৎ হইল। সীতা তখন বনবাসিনী, স্বামী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়া বাল্মীকির তপোবনে আসিয়াছেন। সীতার নিকট গার্গী এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাইলেন,—নরসেবাই পরম ধর্ম্ম, ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-সেবার মধ্য দিয়া নরনারীকে ভালবাসিতে পারিলে তাহার তুল্য আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। কেবল নিজের সাধন ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকা ধর্ম্ম নহে। জগতের কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিলেই ঈশ্বর-সেবা হয়। সংসারত্যাগ ধর্ম্ম নহে, সংসারে থাকিয়া নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহাতেই ভগবান্ তুষ্ট হন।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া নরসেবা গ্রহণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী উভয়েই বিস্মিত হইলেন। গার্গী বলিলেন, "জগতের মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দিয়া আমি কিছুদিন সংসার করিব। এতদিন ভালবাসার ধ্যান করিয়াছি, কিন্তু ভালবাসা দেখি নাই, বাল্মীকির তপোবনে মূর্ত্তিমতী ভালবাসা দেখিয়া আসিয়াছি। তিনিই আমাকে শিখাইয়াছেন, সংসারে নরসেবা দ্বারাই জীবনের সাধ পূর্ণ হয়; সন্ন্যাসিনী উদাসিনী সাজিয়া কেবল যোগ-সাধনায় ধর্ম্ম হয় না। তাই আবার সংসারে আসিলাম। সীতার নিকট আমি এক মহৎ শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি। নরসেবা আমার বড় ভাল লাগিতেছে।"

চির জীবন ব্রহ্মচারিণী গার্গী নরসেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন। জগৎময় তিনি তাঁহার অভীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাইলেন; হৃদয় তাঁহার পরিতৃপ্ত হইল।

সাবিত্রী

"সাবিত্রী" নাম হিন্দুনারীর পরম আদরের সামগ্রী। "সাবিত্রী ভব" অর্থাৎ 'সাবিত্রীর মত পতিব্রতা হও' এই আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ হিন্দু-কুললক্ষ্মীর আর কিছুই নাই। মাতাপিতা আদর করিয়া কন্যার নাম সাবিত্রী রাখেন। সাবিত্রীর সতীত্ব-মাহাত্ম্য হিন্দুনারীর সাধনার বস্তু; সীমন্তের সিন্দূর ও হাতের শাঁখার সঙ্গে সাবিত্রীর পবিত্র নাম যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, সাবিত্রী হিন্দুমহিলার আদর্শ; সাবিত্রীর পতিভক্তি হিন্দুরমণীর হৃদয়কে এক পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ করে। সাবিত্রীর পুণ্যোজ্জ্বল সতীত্বের আলোকে হিন্দু-গৃহ চির আলোকিত, চির শান্তিময়। সীতা ও সাবিত্রী উভয়েই পতিব্রতার আদর্শ; জগতে উভয়ের তুলনা নাই; কিন্তু সীতার সমস্ত জীবনই দুঃখে পরিপূর্ণ বলিয়া সাধারণতঃ মাতাপিতা কন্যার নাম সীতা রাখিতে দ্বিধা বোধ করেন, এবং আশীর্ব্বাদে সীতা অপেক্ষা সাবিত্রীর নামই বেশী প্রচলিত দেখা যায়। সাংসারিক জীবনে "সাবিত্রী" আশীর্ব্বাদই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

অশ্বপতি মদ্রদেশের রাজা। তাঁহার বিরাট রাজ্য, তিনি পরম ধার্ম্মিক ও দানশীল। কিন্তু নিঃসন্তান বলিয়া মনে তাঁহার শান্তি নাই। সন্তান-কামনায় অশ্বপতি বহু যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি করিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। অতঃপর তিনি সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু বৎসর হোম করার পর সাবিত্রীদেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজা পুত্র-বর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দেবী 'তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা জন্মিবে' বলিয়া বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিতা হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাণী মালতী একটি পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহাদের নিরানন্দ গৃহ আনন্দে ভরিয়া গেল, রাজ্যে উৎসবের ঢেউ বহিল। সাবিত্রী দেবীর অনুগ্রহে কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া রাজা তাঁহার নাম রাখিলেন 'সাবিত্রী'। শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত দিন দিন সাবিত্রী বড় হইতে লাগিলেন, তাঁহার রূপে রাজভবন আলোকিত হইয়া উঠিল। রাজা অশ্বপতি কন্যাকে রাজ-পুত্রীর উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিতা করিলেন। ব্রত, পূজা, হোমে সাবিত্রীর বড় আনন্দ, তাহা লইয়াই তিনি তন্ময় থাকেন।

সাবিত্রীর বয়স হইল, মদ্ররাজ তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবর ঘোষণা করা হইল, কিন্তু

সাবিত্রীর উচ্চ শিক্ষাদীক্ষার কথা শুনিয়া কোনও রাজা বা রাজপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইলেন না। অশ্বপতি মহাচিন্তায় পড়িলেন। রূপে গুণে সাবিত্রী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, তাঁহার বিবাহে পাত্রের অভাব? অবশেষে অশ্বপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া সাবিত্রীকে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন।

পিতার আজ্ঞায় সাবিত্রী সখীদিগের সহিত স্বামি-সন্ধানে যাত্রা করিলেন। রথ, অশ্ব ও সৈন্যসহ বৃদ্ধ মন্ত্রি-গণ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। কত দেশ, কত রাজ্য, কত তপোবন, কত তীর্থ মাসের পর মাস তাঁহারা পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কোথাও তাঁহার উপযুক্ত স্বামীর সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে তিনি এক তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তপোবনে রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র লইয়া বাস করিতেন। পূর্ব্বে তিনি শাল্ব-দেশের রাজা ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে বৃদ্ধ ও অন্ধ হওয়ায় শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করে। রাজ্যচ্যুত হইয়া রাজা এই বনে তপস্যায় দিন কাটাইতেছিলেন। পুত্র সত্যবান্ যেমন গুণবান্, তেমনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মাতাপিতার পরিচর্য্যা তাঁহার প্রধান কর্ম্ম। হোমের জন্য কাষ্ঠ-সংগ্রহ, পূজার জন্য পুষ্প-চয়ন, আহারের জন্য ফল-আহরণ, স্নান ও পানের জন্য জল-আনয়ন, মাতাপিতার যাবতীয় সেবা-শুশ্রূষা এবং অতিথির আদর-অভ্যর্থনা,

সমস্তই সত্যবান্‌কে করিতে হয়। সাবিত্রী সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন, সত্যবান্‌কেই তাঁহার উপযুক্ত স্বামী বলিয়া মনে হইল। রাজ-ঐশ্বর্য্য তিনি চাহিলেন না, তপোবনে দরিদ্র সত্যবানের হৃদয়ে যে গুণের পরিচয় পাইলেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ হইল। আর দেশে দেশে ঘুরিবার আবশ্যকতা নাই, তিনি সত্য-বানের সুন্দর মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

সাবিত্রী তাঁহার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া অশ্বপতি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু একমাত্র কন্যার কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কিরূপে সম্প্রদান করিবেন? তিনি পিতা, সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। এমন সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন মনে করিয়া অশ্বপতি তাঁহাকে সাবিত্রী কর্ত্তৃক সত্যবান্‌কে পতি-নির্ব্বাচনের কথা বলিলেন।

নারদ উত্তর করিলেন, "দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্ সর্ব্ব বিষয়েই সাবিত্রীর যোগ্য পাত্র। সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় সুপণ্ডিত, ইন্দ্রের ন্যায় বীর, কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান্; সে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক। কিন্তু তাহার একটি মাত্র দোষ, ঐ দোষ সমস্ত গুণকে নষ্ট করিয়াছে। সত্যবান্ অত্যন্ত অল্পায়ু,

অদ্য হইতে এক বৎসর কাল মাত্র সে জীবিত থাকিবে।”

সত্যবানের অল্পায়ুর কথা শুনিয়া মদ্ররাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “সাবিত্রী তুমি অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর, আজ হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে।”

সাবিত্রী ধীরভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন, “সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন, আর স্বল্পায়ুই হউন; সগুণই হউন, আর নির্গুণই হউন; আমি যখন একবার তাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখন তিনিই আমার স্বামী, অন্য কাহাকেও আমি বরণ করিতে পারিব না।”

সাবিত্রীর দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া নারদ এই বিবাহে সম্মতি দান করিলেন।

সাবিত্রীর বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। মদ্র-রাজের একমাত্র কন্যার বিবাহ, সুতরাং আয়োজন বিরাট-রূপেই হইল। রাজ্যের ইতর ভদ্র সকলেই বহুদিন ধরিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিল। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন অন্ধ, সত্যবান্‌কেই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এইজন্য অশ্বপতি কন্যা-সম্প্রদানের জন্য সাবিত্রীকে লইয়া দ্যুমৎসেনের তপোবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিবাহ-ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইল। অশ্বপতি সাবিত্রীকে রাজকন্যার উপযোগী রত্নালঙ্কার ও

বস্ত্রাদি এবং জামাতাকে যথোপযুক্ত যৌতুক প্রদান করিলেন। সাবিত্রী তাঁহার অভিলষিত স্বামী লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, সত্যবান্‌ও সাবিত্রীর ন্যায় রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিলেন।

বিবাহান্তে অশ্বপতি কন্যাকে উপদেশ দিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলে সাবিত্রী শরীর হইতে সমস্ত বেশভূষা এবং মূল্যবান্ বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিয়া তপোবনে ঋষি-পত্নীর উপযুক্ত বল্কল এবং গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলেন। রাজ-নন্দিনী সাবিত্রী ঋষি-পত্নী সাজিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচর্য্যা, স্বামিসেবা, অতিথিসৎকার, প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা তিনি তপোবনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। স্বামীর মৃত্যুর দিন ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে চিন্তা করিয়া সাবিত্রীর হৃদয় গোপনে গোপনে অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

সাবিত্রী গণনা করিয়া দেখিলেন, সত্যবানের মৃত্যুর আর মাত্র চারি দিন বাকি। তখন তিনি 'ত্রি-রাত্র ব্রত' আরম্ভ করিলেন। ব্রতের কঠোর নিয়মে তিনি শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। সত্যবানের মৃত্যুর পূর্ব্বের দিনের রাত্রি সাবিত্রীর চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে অতিবাহিত হইল। পর দিবস তাঁহার জীবনের আনন্দ, ইহকাল-পরকালের দেবতা, সংসারের আশাভরসা, নারী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।

হৃদয় তাঁহার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও পাখীরা গান করিল, ফুল ফুটিল, গন্ধ গায়ে মাখিয়া বাতাস ছুটিল, পাতায় পাতায় শিশির দুলিতে লাগিল, পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া সূর্য্য উঠিল ; কিন্তু সাবিত্রীর বোধ হইতে লাগিল, আজ যেন পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি স্বামীকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণে সত্যবান্ কুঠার স্কন্ধে লইয়া বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "আজ আপনাকে একাকী যাইতে দিব না, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।"

সাবিত্রীর কথায় সত্যবান্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সে কি সাবিত্রী, তুমি কখনও বনে যাও নাই, বিশেষতঃ উপবাসে আজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, এ অবস্থায় কিরূপে যাইবে ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার কোনও কষ্ট হইবে না, আজ আমি আপনার সঙ্গে যাইবই, আমাকে নিষেধ করিবেন না।"

সত্যবান্ কিছুতেই সাবিত্রীকে নিবারণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তবে তুমি বাবা ও মায়ের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আইস।"

সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমি আজ আর্য্য-পুত্রের সঙ্গে বন দেখিতে যাইব, এক বৎসর যাবৎ তপোবনে আসিয়াছি, কিন্তু বনের শোভা কিছুই দেখিতে পারি নাই, আমাকে আজ যাইতে অনুমতি দিন।" তাঁহারা পুত্রবধূর এই ইচ্ছায় বাধা দিলেন না। সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিলেন। সত্যবান্ অগ্রে, সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

যাইতে যাইতে সত্যবান্ তাঁহাকে বনের কত শোভা দেখাইতে লাগিলেন; সাবিত্রী সমস্তই চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোনও সৌন্দর্য্যই আজ তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি মনে করিতে লাগিলেন, এই বুঝি তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল।

সত্যবান্ গাছ হইতে ফল পাড়িয়া কাঠ কাটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় সাবিত্রীকে কহিলেন, "প্রিয়ে, আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তুমি এইখানে একটু বস, আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করি।"

সাবিত্রীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তিনি স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বৃক্ষ-তলে উপবেশন করিলেন। ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সত্যবান্ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, বনভূমি আলোকিত করিয়া শ্যামবর্ণ এক ভয়ঙ্কর পুরুষ দণ্ড হস্তে সত্যবানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সাবিত্রী প্রণাম করিয়া তাঁহার পরিচয় এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দেব-পুরুষ উত্তর করিলেন, "আমি যম, আজ তোমার স্বামীর জীবনের শেষ দিন, তাহাকে লইতে আসিয়াছি।"

সাবিত্রী যমরাজকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, মৃত্যু সময়ে আপনার দূতেরা আসিয়া মানুষের প্রাণ লইয়া যায়, তবে আপনি স্বয়ং কি জন্য আসিয়াছেন?"

যম উত্তর করিলেন, "সতি, সত্যবান্ পরম ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচারী ও গুণবান্, সেইজন্য আমি স্বয়ং আসিয়াছি।"—এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের শরীর হইতে প্রাণ বাহির করিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। সত্যবানের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, তাঁহার প্রাণহীণ বিবর্ণ দেহ সাবিত্রীর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া যমদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া যমরাজ কহিলেন, "সাবিত্রী, তুমি কোথায় আসিতেছ? ফিরিয়া যাও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমার

স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইতেছেন, আমিও সেইখানে যাইব। স্বামী ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি ?"

যম উত্তর করিলেন, "অদৃষ্ট খণ্ডনের সাধ্য কাহারও নাই, সাবিত্রী ! আমি তোমার পতিভক্তিতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি যে কোনও বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী কহিলেন, "দেব, আমার শ্বশুর রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বনে বাস করিতেছেন, তিনি অন্ধ, দয়া করিয়া তাঁহার চক্ষু দান করুন।"

যমরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। যম কহিলেন, "তুমি পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছ, এখন ফিরিয়া যাও। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া লাভ কি ?"

সাবিত্রী কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ, আমি যখন স্বামীর সঙ্গে রহিয়াছি তখন আমার কোনই কষ্ট বোধ হইতেছে না, আমি স্বামীর সঙ্গেই যাইব।"

যম কহিলেন, "সাধ্বি ! তোমার পতিভক্তি জগতে অতুলনীয়, তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত আর একটি বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী কহিলেন, "আমার শ্বশুর তাঁহার পূর্ব্ব রাজ্য পুনরায় লাভ করুন, আমি এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।"

"আমার বরে তোমার শ্বশুর শীঘ্রই রাজ্য লাভ করিবেন।" এই বলিয়া যমরাজ চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীকে তখনও তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া কহিলেন, "এখন গৃহে ফিরিয়া যাও সাবিত্রী, তুমি বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছ।"

সাবিত্রী কহিলেন, "স্বামী ব্যতীত স্ত্রীলোকের আবার গৃহ কি? আমার স্বামী যেখানে যাইবেন, তাহাই আমার গৃহ।"

যম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার পিতার কোনও পুত্র সন্তান নাই, তাঁহার একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করুক, আমি এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করি।"

যম 'তথাস্তু' বলিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তখনও সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। তিনি কহিলেন, "সাবিত্রী, যতদূর আসিয়াছ তাহাই যথেষ্ট, এই পর্য্যন্ত মানুষের আসিবার শেষ সীমা, ইহার পরে আর তাহাদের যাইবার অধিকার নাই।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিব।"

যমরাজ সাবিত্রীর তেজোপূর্ণ কথা শুনিয়া কহিলেন,

"সাবিত্রী, আমি তোমার সতীধর্ম্ম-মাহাত্ম্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার একশত বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।"

যম কহিলেন, "আমার বরে তুমি শত পুত্রের জননী হইবে।"

যমরাজ আবার চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রী তখনও তাঁহার পশ্চাতে। কিছুক্ষণ পরে যম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "সাবিত্রী আর কেন? তুমি পৃথিবীর শেষ সীমা ছাড়াইয়া স্বর্গের সীমায় আসিয়া পড়িয়াছ, আর তোমার যাইবার অধিকার নাই, তুমি ইচ্ছামত আর একটি বর লইয়া প্রস্থান কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মরাজ, জগতে ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। আপনার কথার অন্যথা হয় না। চতুর্থ বরে আপনি আমাকে শত পুত্রের জননী হওয়ার বর প্রদান করিয়াছেন, অথচ আপনিই আমার স্বামীর প্রাণ লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে কিরূপে আপনার বর-দান সার্থক হইবে? স্বামিহীনার পুত্র-লাভ কিরূপে সম্ভব? অতএব, আমার স্বামী জীবিত হউন, আমি এই বর প্রার্থনা করি।"

যমরাজ বলিলেন, "হে সতীশিরোমণি, পতিভক্তির

জন্য তুমি আমারও ভক্তির পাত্রী। আমি তোমাকে সেই বর-ই প্রদান করিলাম। সত্যবান্ জীবিত হইয়া চারিশত বৎসর তোমার সঙ্গে সুখে বাস করুক,—এই তোমার স্বামীর জীবন গ্রহণ কর, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের প্রাণ মুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

যেস্থানে সত্যবানের মৃতদেহ পড়িয়াছিল সাবিত্রী আহ্লাদিত মনে তথায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীর মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন। সত্যবান্ যেন গভীর নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "সাবিত্রী! আমি এতক্ষণ ঘুমাইয়াছি! তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বে বনে আসিয়াছি, আর এখন রাত্রির অন্ধকারে বন আছন্ন হইয়া গিয়াছে। চল শীঘ্র আশ্রমে ফিরিয়া যাই। বাবা ও মা আমাদিগের বিলম্ব দেখিয়া কতই না জানি চিন্তা করিতেছেন।"

গভীর রাত্রির অন্ধকারে অতি কষ্টে পথ চলিয়া তাঁহারা যখন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অন্ধ দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া পত্নীর সহিত পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য বিষম চিন্তা করিতেছেন এবং অন্যান্য মুনি ঋষিরা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন। তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের বিলম্বের

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবিত্রী সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

অতঃপর দ্যুমৎসেন স্বীয় রাজ্য পাইয়া স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দেশে চলিয়া গেলেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির শত পুত্র হইল। সাবিত্রীও শত পুত্রের জননী হইয়া স্বামীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ভারতের ঘরে ঘরে সতীকুল-রাণী সাবিত্রীর সতীত্ব-মাহাত্ম্য ও পতিপরায়ণতার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিত হইল।

শৈব্যা

পরমধার্ম্মিক দানশীল হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা। পতিগতপ্রাণা রাণী শৈব্যা তাঁহার পত্নী। হরিশ্চন্দ্রের বিস্তৃত রাজ্য, অশেষ পরাক্রম, রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণ, শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান, তাঁহার দানের খ্যাতি স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

একদিন স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অপ্সরাগণের নৃত্যগীত হইতেছে, সমস্ত দেবতা ও ঋষি তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ অপ্সরাদিগের তালভঙ্গ হইল। ইহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অপ্সরাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন,—"তোমরা পৃথিবীতে যাইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবনে আবদ্ধ হইয়া থাক"।

স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে গিয়া থাকিতে হইবে শুনিয়া অপ্সরারা কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহাদের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ কহিলেন, "আমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবে না, তোমরা কিছুকাল পরে অযোধ্যা-রাজ হরিশ্চন্দ্রের স্পর্শে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে।"

অপ্সরারা পৃথিবীতে যাইয়া বিশ্বামিত্রের তপোবনে বাস করিতে লাগিল। তাহারা ইচ্ছামত তপোবনে ভ্রমণ করে, ফুল তোলে, ফল পাড়ে। বিশ্বামিত্র প্রায়ই আসিয়া দেখেন, তাঁহার ফুল-গাছে ফুল নাই, ফলের গাছ ফলশূন্য, গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রোধী বিশ্বামিত্র এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অভিসম্পাত দিলেন, "যাহারা এই বাগানে ফুল বা ফল তুলিতে আসিবে, তাহারাই লতার বন্ধনে বাঁধা পড়িবে।"

পরদিন প্রভাতে সেই অপ্সরাগণ পূর্ব্বের মত ফুল তুলিতে আসিল। গাছে হাত দিতেই চতুর্দ্দিক্ হইতে লতা আসিয়া তাহাদিগকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা সেই লতার বাঁধন হইতে মুক্তি পাইল না। বিশ্বামিত্র আসিয়া অপ্সরাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের কাতর-ক্রন্দনে ঋষির মন গলিল না, তিনি তাহাদিগকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই প্রস্থান করিলেন।

অপ্সরাগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও বন্ধন-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই সময় রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া করিতে বনে আসিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অপ্সরাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার খুব দয়া হইল, তিনি যেমন বন্ধন-

মুক্তির জন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহারা শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

পরদিন বিশ্বামিত্র তপোবনে আসিয়া অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে ধ্যানে বসিয়া জানিতে পারিলেন, অযোধ্যা-রাজ হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রকে ইহার প্রতিফল দেওয়ার জন্য অগ্নিমূর্ত্তি বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ অযোধ্যার দিকে ছুটিলেন। বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, একটা বিশেষ কিছু কাণ্ড ঘটিয়াছে; তিনি সিংহাসন হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র আসন গ্রহণ করিয়াই কহিলেন, "আমি অপ্সরাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন? এই জন্য তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে।"

রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহর্ষি, দুঃখে কাতর হইয়া তাহারা আমাকে ডাকিয়াছিল, আমি যাইয়া স্পর্শ করিবা মাত্রই তাহারা মুক্তি পাইয়াছে। আমি দান-ধ্যান যাগ-যজ্ঞে সর্ব্বদা নিযুক্ত, আমার এই সামান্য অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করুন।"

হরিশ্চন্দ্রের কথায় বিশ্বামিত্র আরও ক্রুদ্ধ হইয়া

কহিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, দানশীল বলিয়া তোমার বড় অহঙ্কার, না? আচ্ছা, আমাকে কিছু দান কর।"

হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "আপনি আমার দান গ্রহণ করিবেন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই আমি দান করিব।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "আমাকে তোমার সমস্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও মণিরত্নাদি সহ সমস্ত রাজ্য দান কর।"

দানবীর রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাই দান করিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, "আমি তোমার দান গ্রহণ করিলাম, কিন্তু দক্ষিণা না দিলে দান সার্থক হয় না। সুতরাং দক্ষিণা দান কর।"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "মহর্ষি, দানের দক্ষিণা আপনাকে আমি সাত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিব।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডার হইতে তাহা আনিয়া দিবার জন্য ধন-রক্ষককে আদেশ করিলেন।

বিশ্বামিত্র বাধা দিয়া কহিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, কাহার ভাণ্ডার হইতে তুমি দান করিবে? পূর্ব্বে সমস্তই তুমি আমাকে দান করিয়াছ, এখন আর এ রাজ্যের কোনও কিছুতেই তোমার অধিকার নাই।"

এইবার হরিশ্চন্দ্রের জ্ঞান হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার

আহার-নিদ্রা দূরীভূত হইল। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেই বিশ্বামিত্র আসিয়া কহিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, এ রাজ্য এখন আমার, ইহাতে আর তোমার বাসের অধিকার নাই। আমার দক্ষিণা পরিশোধ করিয়া দিয়া এখনই অন্য স্থানে প্রস্থান কর।"

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "যে প্রকারেই হউক, আমি যত শীঘ্র পারি আপনার দক্ষিণা পরিশোধ করিব।" এই বলিয়া তিনি স্ত্রী শৈব্যা এবং পুত্র রোহিতাশ্বকে লইয়া নিতান্ত দীনবেশে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যার ধার্ম্মিক দানশীল রাজা আজ পথের ভিখারী, ভিক্ষার উপর তাঁহার নির্ভর। কাশীতেও হরিশ্চন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না, সেখানেও বিশ্বামিত্র যাইয়া প্রাপ্য দক্ষিণার জন্য তাঁহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিরূপে দক্ষিণা পরিশোধ করিয়া ব্রাহ্মণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইলেন না। চিন্তায় চিন্তায় তিনি দিন দিন শুষ্ক ও মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া পতিপ্রাণা শৈব্যা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, "ঋণ-চিন্তা সত্যসত্যই বড় ভীষণ, আর এ ঋণ যে সে লোকের নয়, স্বয়ং বিশ্বামিত্রের, আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া ঋণ ও প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করুন।"

শৈব্যার কথায় হরিশ্চন্দ্র মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন; হায়, যে স্ত্রীকে স্বামীর সর্ব্বদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহাকে দাসীরূপে বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে !—অযোধ্যার রাজমহিষী নীচ দাসী-বৃত্তিতে নিযুক্তা হইবেন ? পত্নী বিক্রয় করিলে লোকেই বা কি বলিবে? এই সময় আবার বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত। এখনও দক্ষিণা যোগাড় হয় নাই শুনিয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন, "শোন হরিশ্চন্দ্র, দক্ষিণা আজ না পাইলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিব।" হরিশ্চন্দ্র ঋষির চরণ ধরিয়া আর সাত দিন সময় চাহিয়া লইলেন। শৈব্যা বলিলেন, "স্বামিন্! ধর্ম্ম আগে, না লোকাচার আগে? আপনি সত্যবাদী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরক্ষা করাই আপনার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমি আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী, আপনার ধর্ম্ম রক্ষার সহায় হওয়া আমার কর্ত্তব্য। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে বিক্রয় করিয়া সত্য রক্ষা করুন। আপনার জন্য দাসী-বৃত্তি করিতে আমি বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইব না।"

হরিশ্চন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। শৈব্যাকে লইয়া তিনি হাটের মাঝে যাইয়া "কে দাসী কিনিবে? কে দাসী কিনিবে?" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এক ব্রাহ্মণের দাসীর প্রয়োজন ছিল, সে আসিয়া শৈব্যাকে কিনিয়া লইল। মাকে ব্রাহ্মণ লইয়া

যাইতেছে দেখিয়া বালক রোহিতাশ্ব তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আঁচল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে শৈব্যা করযোড়ে কহিলেন, "ঠাকুর, আমার পুত্রটিকে সঙ্গে লইতে অনুমতি দিন। এজন্য আপনাকে অতিরিক্ত কিছু মূল্য দিতে হইবে না।"

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের ছিল। সে কহিল, "মূল্য না দিতে হইলেও উহাকে খাইতে ত দিতে হইবে।"

শৈব্যা বলিলেন, "আমাকে আপনি যাহা খাইতে দিবেন, তাহাই আমরা মাতাপুত্রে ভাগ করিয়া খাইব। সেজন্য আপনার অতিরিক্ত কিছু খরচ হইবে না।" ব্রাহ্মণ সম্মত হইল। শৈব্যা স্বামীকে প্রণাম করিয়া রোহিতাশ্বের সহিত ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র মূল্য লইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে গেলেন। বিশ্বামিত্র টাকা গণিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাপ্য সাত-হাজার স্বর্ণমুদ্রা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ক্রোধে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষু হইতে অগ্নি-শিখা বাহির হইল, তিনি কহিলেন, "কি, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে উপহাস ও প্রতারণা! শোন হরিশ্চন্দ্র, আজ যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তুমি আমার প্রাপ্য সমস্ত দক্ষিণা পরিশোধ না কর, তবে আমার অভিসম্পাত তোমাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে।" একে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের

পাপ, তাহার উপর আবার অভিসম্পাত! হরিশ্চন্দ্রের আর কি আছে যে, তাহা বিক্রয় করিয়া তিনি ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন? সহসা তাঁহার মনে হইল, এখনও ত তাঁহার নিজ শরীর অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করিলে বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।

হরিশ্চন্দ্র হাটে যাইয়া কালু নামক এক চণ্ডালের নিকট বিক্রীত হইলেন। এইবার যে অর্থ পাইলেন, তদ্দ্বারা বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধ হইল। ঋণ হইতে মুক্তি পাইয়া হরিশ্চন্দ্রের দুশ্চিন্তা অনেকটা কমিয়া গেল।

অযোধ্যাধিপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র এখন চণ্ডালের দাস। চণ্ডালের আদেশ-পালনই তাঁহার কর্ম্ম। চণ্ডাল রাজাকে মণিকর্ণিকার শ্মশানে শবদাহে নিযুক্ত করিল। তিনি দিবারাত্র শ্মশানে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড শ্মশান, দিনরাত শত শত চিতায় মৃতদেহ দগ্ধ হইতেছে। চিতাধূমে ও দুর্গন্ধে শ্মশানভূমি আচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি অস্থি কঙ্কাল, কোথাও অর্দ্ধদগ্ধ নরমুণ্ড দাঁত বাহির করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, শৃগাল কুক্কুরেরা পচা দুর্গন্ধ নরমাংস লইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছে; কোথাও মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনের বিলাপ ধ্বনিতে পাষাণ গলিয়া যাইতেছে। এই শ্মশান হরিশ্চন্দ্রের বাসস্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র। শব দাহ করিয়া মূল্য-গ্রহণ এবং শবের পরিত্যক্ত শয্যা ও বস্ত্রাদি

সংগ্রহ করাই তাঁহার কার্য্য। পরিধানে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, সর্ব্বশরীর চিতাভস্মে আচ্ছন্ন, হাত পা শবের মেদ ও মজ্জায় অনুলিপ্ত।

আর রাজমহিষী শৈব্যা? তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্তা। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ যে ভাত দেন, রোহিতাশ্বের তিনবার খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, শৈব্যা তাহা খাইয়াই কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রোহিতাশ্বের কাজ ভোরে উঠিয়া ব্রাহ্মণের পূজার ফুল তোলা। বালক প্রত্যহ বিশ্বামিত্রের উদ্যান হইতে ফুল তুলিয়া আনে, ইহাতে বিশ্বামিত্রের পূজার ফুলের অভাব হয়। একদিন তিনি অভিশাপ দিলেন, যে ফুল তুলিতে আসিবে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইবে। প্রাতঃকালে রোহিতাশ্ব বাগানে আসিয়া ফুলগাছে হাত দিবামাত্র একটা সাপ তাহাকে দংশন করিল। বালক বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মায়ের কাছে যাইবার জন্য ছুটিল, কিন্তু কয়েক পা যাইয়াই আর অগ্রসর হইতে পারিল না, সেই স্থানে একটা গাছের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। শৈব্যা পুত্রের জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। শেষে একান্ত অস্থির হইয়া তিনি পুত্রের অনুসন্ধানে যাইবার জন্য ব্রাহ্মণের অনুমতি

চাহিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীয় কার্য্য ক্ষতির ভয়ে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। শৈব্যা নিরুপায় হইয়া গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মন তাঁহার রোহিতাশ্বের আগমন-পথের দিকে পড়িয়া রহিল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঐ বুঝি রোহিত আসিয়া মা বলিয়া ডাকিতেছে। ক্রমেই হৃদয় তাঁহার পুত্রের জন্য পাগল হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় রোহিতের এক খেলার সঙ্গী আসিয়া সর্প-দংশনে তাহার মৃত্যুর সংবাদ দিয়া গেল। শুনিবা মাত্রই শৈব্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজরাণী ছিলেন, রাজ্য গেল, নিজে পরগৃহে দাসীত্ব স্বীকার করিলেন, কেবল পুত্রের মুখ চাহিয়া সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া ছিলেন। সেই সুখশান্তির ফুলটিও আজ ঝরিয়া পড়িল! এই ভীষণ সংবাদ শ্রবণ অপেক্ষা তাঁহার মাথায় শত বজ্রাঘাতও যে ভাল ছিল। ব্রাহ্মণপত্নীর শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া শৈব্যা মৃত পুত্রের নিকট যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তোমার সমস্ত কাজ এখনও শেষ হয় নাই, তাহা শেষ করিয়া তোমার পুত্রের সৎকারের জন্য যাইতে পার,—পূর্ব্বে নয়।" হায় দাসত্ব, ধন্য তোমার মহিমা, মায়ের অধিকার নাই, মৃত পুত্রকে দেখিতে যাইতে!

শৈব্যার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু

উপায় নাই, তিনি বাম হস্তে চোখের জল মুছিতে মুছিতে দক্ষিণ হস্তে গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া যখন পাগলিনী পুত্রের জন্য ছুটিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। পদদ্বয় প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইল, শরীর কণ্টকাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া গেল, কোনও দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, উন্মাদিনীর মত তিনি ছুটিতে লাগিলেন।

মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া শৈব্যা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে তাঁহার বুকফাটা চীৎকারে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কতক্ষণ ক্রন্দনের পর রোহিতাশ্বকে সৎকারের জন্য কোলে তুলিয়া লইয়া শ্মশানের দিকে চলিলেন।

শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র শবদাহে নিযুক্ত। শৈব্যা চণ্ডাল-বেশী স্বামীকে চিনিতে পারিলেন না, তাঁহার সেই সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই। শরীর শীর্ণ, কালিমাখা, চক্ষু কোটরগত, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড। শৈব্যা তাঁহাকে চণ্ডাল মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া পুত্রের সৎকারের জন্য কাতর বচনে অনুরোধ করিলেন। দিনরাত শত শত পুত্রশোকাতুরা জননীর ক্রন্দন শুনিয়া শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং শৈব্যার আকুল বিলাপে তাঁহার হৃদয় গলিল না। তিনি শৈব্যার নিকট শব-দাহের জন্য পঞ্চাশ কাহন কড়ি দাবী করিলেন। যাঁহার একটি কাণা কড়ির সম্বল নাই, তিনি পঞ্চাশ কাহন কড়ি

কোথায় পাইবেন ? শৈব্যা হতাশ-চিত্তে মৃতপুত্র কোলে লইয়া শ্মশানের একধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "হা স্বামিন্, হা হরিশ্চন্দ্র ! একবার দেখিয়া যাও, তোমার আদরের রেহিতের আজ কি দশা। যাহার গায়ে সামান্য আঘাত লাগিলে তুমি কত কাতর হইয়া উঠিতে, দারুণ সর্পাঘাতে তোমার সেই প্রিয়পুত্র রোহিত আজ মৃত। এ সময় তুমি কোথায় ? একবার দেখিয়া যাও, অর্থাভাবে তোমার পুত্রের সৎকার হইতেছে না।"

হরিশ্চন্দ্রের কাণে দুইটি কথা মাত্র প্রবেশ করিল,—'হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্ব'। ধীরে ধীরে তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, কে এই রমণী, হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্ব বলিয়া বিলাপ করিতেছে ? তিনি ধীরে ধীরে শৈব্যার নিকটে আসিলেন, চিতাগ্নির অস্পষ্ট আলোকে শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শৈব্যাকে চিনিতে পারিলেন না, রোহিতাশ্বকে অল্প অল্প মনে পড়িতে লাগিল। বহুদিন পরে তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ-মমতার একটু সাড়া পড়িল। তিনি আবার ভাল করিয়া দেখিলেন ! শৈব্যার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—"হা অযোধ্যানাথ হরিশ্চন্দ্র, একবার দেখিয়া যাও, তোমার শৈব্যা আজ মৃত পুত্র বুকে লইয়া শ্মশানে !"

হরিশ্চন্দ্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, "কে তুমি রমণী! তোমার নাম কি শৈব্যা? আর এই মৃত পুত্র কি রোহিতাশ্ব?"—

শৈব্যা কহিলেন, "হাঁ চণ্ডাল, আমার নাম শৈব্যা, আর এই অযোধ্যা-রাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব।"

হরিশ্চন্দ্র আকুল আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "শৈব্যা, শৈব্যা, আমিই সেই চণ্ডালাধম নিষ্ঠুর হরিশ্চন্দ্র। —আমার রোহিত নাই?" বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

শৈব্যা বিষম সমস্যায় পড়িলেন, এ চণ্ডাল কে? এ কি সত্য, না প্রতারণা? অযোধ্যা-রাজ হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাল-বৃত্তি গ্রহণ, এ কি সম্ভব? তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত চণ্ডাল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তিনি বিপত্তারণ মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন, "নারায়ণ, আবার আমাকে এ কি বিপদে ফেলিলে? শেষে কি সতীত্বধনও চণ্ডালের নিকট বিসর্জ্জন দিতে হইবে?"

হরিশ্চন্দ্র জ্ঞান লাভ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, "শৈব্যা, শৈব্যা!"

শৈব্যা কহিলেন, "কে তুমি? আমাকে যথার্থ পরিচয় দাও। আমি অবলা, বিপদ্‌গ্রস্তা, আমাকে প্রতারণা করিও না।"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "শৈব্যা, তোমার এই সন্দেহ স্বাভাবিক, আমিই সেই অযোধ্যারাজ হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র,

যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিল এবং দানের দক্ষিণা দানে অসমর্থ হইয়া শেষে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়াছে, তাহাতেও ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় অবশেষে শ্মশানে চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। শৈব্যা, সন্দেহ দূর কর, আমিই তোমার স্বামী হরিশ্চন্দ্র, আমি আজ চণ্ডালের দাস। শ্মশানে শবদাহ করা আমার কর্ম্ম।"

শৈব্যা চিনিতে পারিলেন, ইনিই তাঁহার স্বামী হরিশ্চন্দ্র। তাঁহার শোক-সিন্ধু আরও উথলিয়া উঠিল। "স্বামিন্, আপনার অদৃষ্টে এও ছিল? হায়, এই দেখুন আমাদের রোহিত আর নাই, আজ ফুল তুলিতে যাইয়া সর্পাঘাতে শেষ হইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া শৈব্যা স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্রও 'হা বৎস, হা রোহিত' বলিয়া বুকে করাঘাত করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "শৈব্যা, অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে, পুত্র রোহিত যখন গিয়াছে, তখন আমাদেরও আর এ জীবন রাখিয়া লাভ নাই। আইস, রোহিতের সঙ্গে আমরাও চিতায় পুড়িয়া মরি,—সমস্ত শোকের অবসান হউক।"

চিতা সজ্জিত করিয়া রোহিতাশ্বকে তাহার উপর শয়ন করান হইল। তারপর হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা অগ্নি হস্তে

ব্রাহ্মণ্য দেবকে প্রণাম করিয়া চিতায় আগুন দিলেন। এমন সময় স্বয়ং ধর্ম্মরাজ সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমার এবং শৈব্যার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"

ইন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "হে সত্যপরায়ণ দানবীর হরিশ্চন্দ্র, তোমরা ধর্ম্মবলে দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। এখন তোমরা পুত্র রোহিতাশ্বের সহিত নিজরাজ্যে গমন কর।" এই বলিয়া দেবরাজ রোহিতাশ্বের উপর অমৃত বর্ষণ করিবামাত্র সে পূর্ব্বের মত সুন্দর শরীর লাভ করিয়া মায়ের কোলের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্বর্গ হইতে তাঁহাদের উপর পুষ্প-বৃষ্টি হইল। হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, তোমার দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া আমিই কালু চণ্ডালরূপে তোমাকে ক্রয় করিয়াছিলাম, এখন তুমি মুক্ত হইলে।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "আমিই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে সাধ্বী শৈব্যাকে দাসীরূপে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলাম, ইনি স্বীয় ধর্ম্ম ও সতীত্ব বলে এখন নিজেই মুক্ত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র, তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ কর, সত্য সত্যই তুমি দানশীল মহাপ্রাণ নরপতি।"

হরিশ্চন্দ্র দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া স্ত্রী ও পুত্র সহ অযোধ্যায় যাইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যাগযজ্ঞ,

ব্রত, দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক শৈব্যার সহিত স্বর্ণরথে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

দময়ন্তী

বিদর্ভ-রাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী। চাঁদের আলোর মত তাঁর রূপ। সখীদিগকে লইয়া যখন তিনি প্রমোদ-বনে ক্রীড়া করেন, তখন মনে হয় বুঝি নক্ষত্র লইয়া চাঁদ উঠিয়াছে। মানুষ ত দূরের কথা, দেবতা ও অপ্সরাদিগের মধ্যেও দময়ন্তীর মত রূপ কাহারও নাই। পদ্ম যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপও তেমনই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মহারাজ নল নিষধ-দেশের রাজা। তিনি কন্দর্পের মত রূপবান্, ইন্দ্রের মত বীর, বশিষ্ঠের মত পণ্ডিত। বহুদূর-বিস্তৃত রাজ্য, প্রবল প্রতাপ, অতুল ঐশ্বর্য্য। তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, প্রজাবৎসল নরপতি; তাঁহার রূপ ও যশের খ্যাতি ত্রিভুবনময় পরিব্যাপ্ত।

দময়ন্তী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। ভাদ্রের ভরা নদীর মত তাঁহার শরীরের কানায় কানায় লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে। অঙ্গের প্রতি সঞ্চালনে রূপের জ্যোতিতে যেন চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়া উঠে।

হৃদয়ও তাঁহার যৌবনের সুধারসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় সখীরা মহারাজ নলের রূপগুণের কথা তাঁহাকে শুনাইল। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন দময়ন্তী নলরাজের প্রশংসা শুনিলেন; তারপর তিনি নিজেই সখীদিগকে নিষধ-রাজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সখীরা বুঝিতে পারিল, দময়ন্তী ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণের গোপন পুরে নিষধ-রাজের জন্য আসন পাতিতেছেন।

মহারাজ নলও বয়স্যগণের মুখে বিদর্ভ-রাজকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রজাপতির দূত উভয়ের হৃদয়-রাজ্যে প্রণয়-ফুল ফুটাইয়া তুলিলেন।

একদিন নল দময়ন্তীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া প্রমোদ-কাননে বেড়াইতেছেন, এমন সময় একদল সোনার হাঁস আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নল হংসের অপরূপ রূপ দেখিয়া একটিকে ধরিয়া ফেলিলেন। হংস ধরা পড়িয়া নলকে কহিল, "মহারাজ, আমাকে মুক্তি দান করুন, আমি বিদর্ভ-নগরে যাইয়া রাজকুমারী দময়ন্তীর নিকট আপনার হৃদয়-ভাব প্রকাশ করিব, যেন তিনি আপনাকেই পতিরূপে বরণ করেন।" নল হংসকে ছাড়িয়া দিলেন, হংস উড়িয়া গেল।

বিদর্ভ-নগরে দময়ন্তী সখীদিগকে লইয়া অন্তঃপুরের

পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছেন, এমন সময় সেই হংসের দল সেখানে যাইয়া উড়িয়া পড়িল। এমন সুন্দর হাঁস দময়ন্তী আর কখনও দেখেন নাই, তাঁহার ইচ্ছা হইল, একটিকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া রাখিবেন। সখীদের লইয়া তিনি হাঁস ধরিবার জন্য ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। হাঁস আর ধরা দেয় না। দময়ন্তী একটি হাঁসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দূরে আসিয়া পড়িলেন, সখীরা অন্য দিকে হাঁস ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অবসরে হংস দময়ন্তীকে বলিল, "রাজকুমারি, নিষধদেশে নল নামে এক রাজা আছেন। পৃথিবীতে তাঁহার মত রূপবান্ পুরুষ আর নাই, যদি আপনি তাঁহার রাণী হইতে পারেন, তবে আপনার এই সুন্দর রূপ সার্থক হইবে। আপনি নারীকুলের রত্নস্বরূপ, মহারাজ নলও পুরুষ-রত্ন। আপনাদের উভয়ের মিলন হইলে মণিকাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় পরম সুন্দর হইবে।"

দময়ন্তী কহিলেন, "হে হংসরাজ, তুমি নিষধ-রাজকে বলিও, এ হৃদয় তাঁহারই জন্য আকুল হইয়াছে।"

হংস নলকে এই সংবাদ দিবার জন্য নিষধ-রাজ্যের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

হংস-মুখে নলের প্রশংসাবাদ শুনিয়া অবধি দময়ন্তীর হৃদয় একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। সঙ্গীত, হাস্যকৌতুক,

ক্রীড়া, আহার-বিহার, কিছুই আর তাঁহার ভাল লাগে না। চোখে ঘুম নাই, চিন্তায় চিন্তায় মুখ মলিন ও শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সখীরা বুঝিতে পারিল, নলের বিরহেই রাজকুমারীর এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

বিদর্ভ-রাজ কন্যাকে যৌবন-সীমায় উপনীত দেখিয়া স্বয়ংবরের জন্য রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দময়ন্তী-রূপ রত্ন লাভ করিবার জন্য নানাদেশ হইতে রাজগণ বিদর্ভ-নগরে আসিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদের মুখে দময়ন্তীর দেবদুর্ল্লভ রূপ ও তাঁহার স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভ-রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথে মহারাজ নলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। নলের সুন্দর রূপ দেখিয়া দেবতারা বিস্মিত হইলেন। পৃথিবীতে মানুষের শরীরে এমন রূপ তাঁহারা কখনও দেখেন নাই, নলের রূপের নিকট তাঁহাদের রূপ যেন ম্লান বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা নলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন, "হে নিষধরাজ নল, তুমি সত্যপরায়ণ ও ধাৰ্ম্মিক, তোমার উপর আমরা একটি দৌত্যকার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে উপকৃত কর।"

নল তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমি

সানন্দচিত্তে আপনাদের কর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি, কি করিতে হইবে আদেশ করুন।”

দেবরাজ বলিলেন, “আমরা দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য তাহার স্বয়ংবর-সভায় যাইতেছি, তুমি আমাদের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বল যে, ‘ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তোমাকে পাইবার জন্য আসিতেছেন, তুমি তাঁহাদের একজনকে পতিত্বে বরণ কর।”

নল বলিলেন, “দেবরাজ, আমিও দময়ন্তী-লাভের আশায় বিদর্ভ-নগরে যাইতেছি, কাজেই আমার দ্বারা আপনাদের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হওয়া সম্ভব নহে, অন্যের উপর আপনারা এই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।”

দেবরাজ বলিলেন, “নল, তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, সুতরাং ধর্ম্মতঃ তুমি এখন সে কাজ করিতে বাধ্য।”

দময়ন্তী-লাভ তাঁহার পক্ষে নিশ্চিত জানিয়া মহারাজ নল আশায় উৎফুল্ল হইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, দেবগণের কথায় তাঁহার সে আশা শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিন্তু কি করিবেন? উপায়ান্তর নাই, তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ধর্ম্মরক্ষার জন্য দেবতাদের দূতরূপে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। নল কহিলেন, “দেবরাজ, শত শত প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত রাজ-অন্তঃপুরে আমি কিরূপে প্রবেশ করিব?”

ইন্দ্র বলিলেন, "আমাদের বরে তুমি অদৃশ্য দেহে দময়ন্তীর গৃহে গমন করিতে পারিবে, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না।"

মহারাজ নল বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সেখান হইতে দেবতাদের দূতরূপে বিদর্ভদেশে যাত্রা করিলেন। দেবতাদের বরে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, তিনি অদৃশ্য হইয়া দময়ন্তীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নল লোকমুখে দময়ন্তীর যে রূপের কথা শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহারা দময়ন্তীর রূপের শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারে নাই। এই সেই দময়ন্তী, তিনি যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বড় আশায় নিষধ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সেই দয়মন্তী, যিনি নলকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহারই ধ্যানে সেই মিলন-মুহূর্ত্তের আশায় বসিয়া আছেন। কিন্তু নল তখনই দময়ন্তীর চিন্তা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিলেন; তাঁহার মনে হইল, তিনি এখন দেবদূত, দেবতাদের আদেশানুসারে কার্য্য করাই এখন তাঁহার কর্ত্তব্য, দময়ন্তীর চিন্তা এখন তাঁহার পক্ষে পাপ।"

দময়ন্তীও নলরাজকে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দময়ন্তীর বোধ হইল, কোনও দেবতা অথবা গন্ধর্ব্ব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, নতুবা মানুষে এত রূপ সম্ভব নহে।

তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আর কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে প্রহরী সর্ব্বদা পাহারা দিতেছে, কিরূপে আপনি এখানে আসিতে পারিলেন?"

নিষধরাজ সহাস্যে কহিলেন, "বিদর্ভ-রাজনন্দিনি! আমি নিষধ-রাজ নল, দেবতাদের দূতরূপে এখানে আসিয়াছি, তাঁহাদের বরে আমি অদৃশ্য-দেহ লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তোমাকে লাভ করিবার জন্য স্বয়ংবরে আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে তোমার যাঁহাকে ইচ্ছা হয় বরণ করিও।"

দময়ন্তী সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "আমি দেবগণকে নমস্কার করি। কিন্তু এ হৃদয় আপনার, হংসমুখে আপনার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আপনাকেই আমি স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, এই স্বয়ংবরের আয়োজন কেবল আপনার জন্য, আপনি যদি আমাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হ'ন, তবে যে প্রকারেই হউক এই জীবন বিসর্জ্জন দিব, তথাপি অপর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না।"

নল বলিলেন, "দময়ন্তি, দেবগণের চরণ-ধূলিরও আমি যোগ্য নহি। তাঁহারা যখন তোমাকে গ্রহণ করিতে উপস্থিত, তখন কেন মনুষ্যকে বরণ করিতে চাও? তুমি দেবতাকে বরণ করিলে উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কার

পরিধান করিয়া পরম সুখে স্বর্গে বাস করিতে পারিবে। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম ইঁহাদিগকে দেব-কন্যারাও স্বামিরূপে পাইবার জন্য কত তপস্যা করেন, আর তুমি অনায়াসে তাঁহাদিগকে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও কেন আমার প্রতি এত অনুরাগিণী হইয়াছ?"

নলের কথায় দময়ন্তীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, তিনি অতি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনাকেই স্বামী বলিয়া জানিয়াছি, আপনাকেই আমি বরণ করিব, আমি দেবতা চাই না,—স্বর্গ চাই না।"

দময়ন্তীর হৃদয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া নল বলিলেন, "আমি দেবগণের দূতরূপে আসিয়াছি, এখন যদি তোমাকে গ্রহণ করি, তবে আমাকে পাপভাগী হইতে হইবে।"

দময়ন্তী বলিলেন, "মহারাজ, স্বয়ংবর-সভায় দেবগণ, রাজগণ এবং আপনি উপস্থিত থাকিবেন, সকলের সম্মুখে আমি আপনার কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিব, তাহা হইলে আর আপনাকে পাপভাগী হইতে হইবে না।"

মহারাজ নল সেখান হইতে দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক দময়ন্তী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্তই জানাইলেন।

দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভা। নানাদেশ হইতে আগত রাজগণ এবং দেবগণ সভা আলোকিত করিয়া নিজ নিজ

আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পরিহিত মণি-রত্নাদি-খচিত বসনভূষণ ও মুকুটের আভায় সভাস্থলে যেন বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। দময়ন্তী সখীদিগের সহিত বর-মাল্য হাতে লইয়া ধীরে ধীরে সভামধ্যে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমনে সভার সৌন্দর্য্য যেন আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। নক্ষত্রমণ্ডিত শরতের নির্ম্মল গগনে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ এবং বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সভাস্থ সকলেই নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, অমন রূপ মানবীর শরীরে অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল। প্রত্যেকের হৃদয় এই দময়ন্তী-রত্ন লাভ করিবার জন্য আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দেবতাদিগের মায়ায় দময়ন্তী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ইন্দ্র, বরুণ, যম, অগ্নি, প্রত্যেকেই নলরাজের রূপ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন; কে প্রকৃত নল, দময়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে তিনি নলকে বরণ করিবেন? তখন তিনি করযোড়ে কহিলেন, "হে দেবগণ, আমাকে আর ছলনা করিবেন না, আমি পূর্ব্ব হইতেই নিষধ-রাজ নলকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব আমি আজ তাঁহাকেই মাল্য অর্পণ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনারা ধর্ম্মের রক্ষক, দয়া করিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

দময়ন্তীর কথায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করিলেন। দময়ন্তীর আশা পূর্ণ হইল, তিনি মহারাজ নলের গলায় বর-মাল্য পরাইয়া দিয়া ধন্য হইলেন। তারপর নল ও দময়ন্তী দেবতাদিগকে প্রণাম করিলেন; দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেকে নলকে এক একটি বর দিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

কলি দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য আসিতেছিলেন, পথে দেবতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় যখন জানিতে পারিলেন, দময়ন্তী দেবতাদিগকে অবহেলা করিয়া একজন মানুষকে বরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার রাগের সীমা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপেই হউক, নল ও দময়ন্তীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেন।

মহা সমারোহে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ হইয়া গেল। উভয়ে উভয়কে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। নল কিছু দিন বিদর্ভনগরে বাস করিয়া দময়ন্তীকে লইয়া নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সুখে শান্তিতে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

এগার বৎসর কাটিয়া গেল। তাঁহাদের ইন্দ্রসেন নামে একটি পুত্র এবং ইন্দ্রসেনা নামে একটি কন্যা জন্মিল। কলি বহু চেষ্টা করিয়াও পুণ্যাত্মা নলের শরীরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; অবশেষে একদিন সুবিধা পাইলেন। নল একদিন মূত্রত্যাগের পর পা ধুইতে

ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এই অপরাধে কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তাঁহার চেষ্টা হইল, নলকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা।

কলির শঠতায় মহারাজ নল তাঁহার ভ্রাতা পুষ্করের সহিত পাশাখেলায় পরাজিত হইলেন। ফলে তাঁহাকে দময়ন্তীর সহিত বনবাসী হইতে হইল। ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে বিদর্ভনগরে তাহাদের মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার রাজ্য, রথ, অশ্ব, হস্তী, মণিমুক্তা, রত্নালঙ্কার সমস্তই পড়িয়া রহিল, তিনি দময়ন্তীর সহিত মাত্র একখানি কাপড় পরিয়া বনে বনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। যে দিন কিছু ফলমূল যোগাড় করিতে পারেন, সে দিন আহার, হয় ; যে দিন তাহা পারেন না, উপবাসেই সেদিন যায়।

একদিন মহারাজ নল ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় কতকগুলি সুন্দর পক্ষী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উড়িয়া পড়িল। উহাদের পাখা সোনার তৈয়ারী। পাখীগুলি দেখিয়া নলের খুব আনন্দ হইল ; তিনি মনে করিলেন, উহাদিগকে ধরিতে পারিলে পক্ষি-মাংস খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ এবং পাখাগুলি বিক্রয় করিয়া অর্থের অভাব দূর করিবেন। এই আশায় তিনি নিজের পরণের কাপড়খানা পাখীর ঝাঁকের উপর ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাখীগুলি তৎক্ষণাৎ সেই কাপড়

লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কাপড় হারাইয়া নল অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। অগত্যা নিরুপায় হইয়া পত্নীর কাপড়ের একদিক্ পরিয়া তাঁহাকে লজ্জা নিবারণ করিতে হইল।

নিজের অদৃষ্টের জন্য নল তত চিন্তিত না হইলেও দময়ন্তীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। যিনি জীবনে কখনও দুঃখ কেমন তাহা জানেন না, আজ তাঁহাকে বনাভ্যন্তরে অনাহারে একবস্ত্রে বৃক্ষতলে দিন কাটাইতে হইতেছে। শত শত প্রহরী-বেষ্টিত রাজ-অন্তঃপুরে যিনি একদিন পরম শান্তিতে দিবারজনী অতিবাহিত করিতেন, আজ তাঁহাকে হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বনভূমিতে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। পত্নীর এই দুঃখদুর্দ্দশা-দর্শনে নল হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন, তিনি তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে বিদর্ভ রাজ্যে পিতার কাছে যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। দময়ন্তী বলিলেন, "মহারাজ, আমার জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। আপনার সঙ্গে থাকিয়া বনবাসেও আমার পরম সুখ। আপনাকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোন্ প্রাণে কোথায় সুখের সন্ধানে যাইব? আপনি যখন এই বনে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িবেন, দুঃখের চিন্তায় যখন আপনার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন আমি আপনার সেই দুঃখ দূর করিব।"

একদিন দময়ন্তী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, নল তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ভাগ্য চিন্তা করিতেছেন। অনেক চিন্তার পর তিনি দময়ন্তীকে ছাড়িয়া যাওয়াই ঠিক করিলেন। দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তিনি বাধ্য হইয়া কোনও আত্মীয়-স্বজনের নিকট যাইয়া আশ্রয় লইবেন, তাঁহাকে আর বনে বনে ঘুরিয়া কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। মহারাজ নল এইরূপ চিন্তা করিয়া দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছু দূর গমন করিলেন। রাজনন্দিনী রাজবধূ দময়ন্তীকে ব্যাঘ্রভল্লুক-পরিপূর্ণ নিবিড় বনে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ভাবিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রিতা দময়ন্তীর নিকটে বসিলেন। আবার উঠিলেন, আবার ফিরিয়া আসিলেন। শেষে 'ধর্ম্মই দময়ন্তীকে রক্ষা করিবেন' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দময়ন্তী উঠিয়া দেখিলেন, তিনি একাকিনী, স্বামী নিকটে নাই, চারিদিকে বনের তরুরাজি যেন নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, স্বামী নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি 'হা নাথ! হা মহারাজ!' বলিয়া হৃদয়ভেদী চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে স্বামীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতিধ্বনি কেবল তাহার

উত্তর দিল। সতী নিজের জন্য ভাবিলেন না, অনাহারে মরিবেন, বা বন্য জন্তুরা তাঁহাকে খাইয়া ফেলিবে, এ ভয়েও তিনি ভীত হইলেন না। প্রধান চিন্তা তাঁহার স্বামীর জন্য। তিনি আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন, "হে দেবতা, হে প্রাণনাথ, আমি আমার নিজের জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে শোক করিতেছি না, আপনি এখন অসহায় হইয়া কিরূপে দিন কাটাইতেছেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইলে কাহার সেবাযত্নে আপনি শান্তি লাভ করিবেন, কেবল এই চিন্তা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।"

দময়ন্তী উন্মাদিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর অন্বেষণে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কণ্টকে ও বৃক্ষশাখায় তাঁহার শরীর ও চরণ ক্ষতবিক্ষত হইল। এমন সময় এক ভীষণ অজগর তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তিনি আর সেই সর্পের গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না, ধীরে ধীরে অজগর তাঁহাকে গিলিতে লাগিল। কিন্তু সাধ্বী তথাপি নিজের মৃত্যুভয়ে কাতর হইলেন না, কেবল স্বামীর জন্যই বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ, অজগর আমাকে আজ গ্রাস করিতেছে, এ সময় আপনি কোথায়? যখন আমার কথা আপনার মনে পড়িবে, তখন আপনার কি অবস্থা হইবে বলিতে পারি না। আপনি যখন শাপমুক্ত হইয়া আবার রাজ্য

লাভ করিবেন, তখন আপনি শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইলে কে আপনার যত্ন ও শুশ্রূষা করিবে ?"

দময়ন্তীর বিলাপ শুনিয়া এক ব্যাধ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একখানি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল, সে তাড়াতাড়ি অজগরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দময়ন্তীকে রক্ষা করিল। তৎপর জল দ্বারা দময়ন্তীর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বল প্রকাশ করিতে লাগিল। সে দময়ন্তীর জীবন রক্ষা করিলেও সতী এই অপরাধের জন্য তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না, তিনি ব্যাধকে অভিসম্পাত দিলেন, "যদি আমি নল ভিন্ন অপর পুরুষকে কখনও চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে এই মুহূর্ত্তে পাপিষ্ঠ ব্যাধ এই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করুক। সতীর অভিসম্পাত নিষ্ফল হইল না, ব্যাধ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পড়িয়া জীবন হারাইল।

পাগলিনী দময়ন্তী কয়েকদিন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়া শেষে একদল বণিকের দেখা পাইলেন, সেই বণিকেরা চেদি দেশে যাইতেছিল। দময়ন্তীও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া একদল বালক হাততালি দিয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। রাজমাতা তখন রাজবাড়ীর জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া

ছিলেন। তিনি দময়ন্তীকে এই অবস্থায় পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া দাসী পাঠাইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইলেন। তাঁহার ছিন্ন বস্ত্র, ধূলি-মাখা শরীর ও শুষ্ক মুখ দেখিয়া রাজমাতার বড় দয়া হইল। তিনি দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা? কাহার স্ত্রী, কেনই বা এমন করিয়া পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

দময়ন্তী রাজমাতাকে তাঁহার দুঃখের কথা বলিলেন, কেবল তিনি যে রাজরাণী ছিলেন এবং নিষধ-রাজ নল যে তাঁহার স্বামী এই কথা প্রকাশ করিলেন না। রাজমাতা তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি আমার এইখানে থাক, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে লোক পাঠাইব। তোমার স্বামীও হয়ত ঘুরিতে ঘুরিতে এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। আমার কাছে তোমার কোনও কষ্ট হইবে না, আমার কন্যা সুনন্দার সখীর মত তুমি এখানে থাকিবে।"

দময়ন্তী বলিলেন, "আমি এখানে আপনার কাছে থাকিতে পারি, কিন্তু আমার কয়েকটা নিয়ম আছে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইব না, কাহারও পা ধোয়াইতে পারিব না, কোনও পুরুষের সম্মুখে বাহির হইব না,— যাহারা আমার স্বামীর সন্ধান লইয়া আসিবে আমি নিজে তাহাদিগকে আমার স্বামী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।" রাজমাতা তাহাতেই সম্মত হইলেন; দময়ন্তী সুনন্দার সখী-

রূপে পরম সমাদরে সে স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ কষ্টের অনেকটা লাঘব হইল, কিন্তু স্বামীর চিন্তায় মনের সুখ ফিরিয়া পাইলেন না।

এদিকে মহারাজ নল ঘুরিতে ঘুরিতে অন্য এক বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কর্কোটক নামে একটি সাপ তাঁহাকে কামড়াইল, ইহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। কর্কোটক নারদের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই বনে বাস করিতেছিলেন। নলের স্পর্শমাত্র তিনি শাপ-মুক্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এই রূপ পরিবর্ত্তনে মঙ্গল হইবে। কেহ আপনাকে চিনিতে পারিবে না, আপনি অযোধ্যা-রাজ্যের রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন, সেখানে তাঁহার সারথি এবং পাশা খেলার সঙ্গী হইয়া কিছুকাল যাপন করিবেন, তারপর আবার আপনার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বরূপ এবং স্ত্রী সমস্তই ফিরিয়া পাইবেন। এই পোষাক গ্রহণ করুন, যখনই আপনি ইহা পরিবেন, তখনই আপনি আবার পূর্ব্বের রূপ ফিরিয়া পাইবেন।" এই বলিয়া কর্কোটক নলরাজকে সুন্দর একজোড়া পোষাক দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ নলও কর্কোটকের কথানুসারে অযোধ্যায় যাইয়া রাজা ঋতুপর্ণের গৃহে বাহুক নাম ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তীর পিতা ভীম কন্যা ও জামাতার বনবাসের

সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু নল দময়ন্তীর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। অবশেষে সুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ চেদি রাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন।

আর একজন ব্রাহ্মণ অযোধ্যা নগরে ঋতুপর্ণ রাজার সভায় যাইয়া বাহুককে দেখিতে পাইলেন; বাহুকের কথাবার্ত্তায় তাঁহাকেই ছদ্মবেশী নল বলিয়া সন্দেহ হইল। কিন্তু নলের এখন পূর্ব্ব রূপ ও সৌন্দর্য্য নাই, কর্কোটকের দংশনে তিনি নিতান্ত কুৎসিৎ হইয়া গিয়াছেন, কাজেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে এই সংবাদ দিলেন। দময়ন্তীরও সন্দেহ হইতে লাগিল। অবশেষে দময়ন্তী এক উপায় আবিষ্কার করিলেন। জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আবার অযোধ্যা রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণকে বলিলেন, "মহারাজ, বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর স্বামী বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হইবে, আপনি ইচ্ছা করিলে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইতে পারেন!" বাহুকও এই ঘোষণা শুনিলেন, দময়ন্তীর পুনরায় স্বয়ম্বরের

কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অতিকষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিলেন।

রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভদেশে যাত্রা করিলেন। বাহুক তাঁহার সারথি, সুতরাং তাঁহাকেও যাইতে হইল! রথ বিদর্ভ নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলে রথের শব্দ দময়ন্তীর নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পূর্ব্বে নলরাজ রথে আরোহণ করিলে রথের যে প্রকার শব্দ হইত, এই শব্দও ঠিক সেই প্রকার। দময়ন্তী সারথি বাহুককে দেখিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল।

রাজা ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে আসিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ম্বরের কোনও প্রকার আয়োজনই দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারিলেন না। রাজা ভীম তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "অনেকদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

বাহুক প্রকৃতই নল কি না দময়ন্তী দাসী পাঠাইয়া দিয়া নানা ভাবে তাহা পরীক্ষা করিলেন। তিনি পুত্র ইন্দ্রসেন এবং কন্যা ইন্দ্রসেনাকে দাসীর সহিত নলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বহুদিন অদর্শনের পর নল তাঁহার বড় আদরের পুত্রকন্যাকে দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে কোলে বসাইয়া

পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। কিন্তু প্রকাশ করিলেন না যে তিনিই তাহাদের রাজ্যচ্যুত পিতা নল।

দাসীর মুখে বাহুকের উক্ত ভাবান্তরের কথা শুনিয়া তিনিই যে নল সে বিষয়ে দময়ন্তীর আর সন্দেহ রহিল না, তথাপি তিনি স্বয়ং একবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিলেন। জননী কন্যার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া মহারাজ ভীমকে এ কথা জানাইলেন। দময়ন্তী পিতার অনুমতি লইয়া বাহুক-রূপী নলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দময়ন্তী বুঝিতে পারিলেন, ইনিই তাঁহার স্বামী নিষদ-রাজ নল। তাঁহার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। তিনি স্বামীর পদধূলি লইয়া ধন্য হইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দের অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল!

মহারাজ নল কর্কোটক প্রদত্ত পোষাক পরিধান করিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু দময়ন্তীর পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না। বুদ্ধিমতী দময়ন্তী স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ, সংসারে আপনাদের অজ্ঞাত কিছুই নাই, দয়া করিয়া বলুন, আমি পবিত্র কি অপবিত্র, যদি অপবিত্র হইয়া থাকি, তবে এই মুহূর্ত্তে যেন আমার জীবন শেষ হয়।"

দৈববাণী হইল, "হে নল, আমরা এই তিন বৎসর

ধরিয়া দময়ন্তীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। দময়ন্তীর শরীর ও মন পরম পবিত্র, কোনও প্রকার পাপ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেবল তোমাকে লাভ করিবার জন্যই আবার স্বয়ম্বরের মিথ্যা ঘোষণা করিয়াছিল। তুমি নিঃসন্দেহচিত্তে উহাকে গ্রহণ করিয়া রাজ্যে ফিরিয়া যাও, তোমাদের জীবন সুখশান্তিময় হউক।”

মহারাজ নলের আর কোনও সন্দেহ রহিল না। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া তিনবৎসর পরে আবার স্বামিস্ত্রী মিলিত হইলেন। দীর্ঘ বিরহ ভোগের পর এই মিলনানন্দ পরম তৃপ্তিজনক বলিয়া বোধ হইল।

কিছুদিন বিদর্ভরাজ্যে বাস করিয়া নলদময়ন্তী নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের রাজ্য আবার তাঁহাদের হইল। প্রজারা তাঁহাদিগকে পাইয়া রাজ্যময় আনন্দ ও উৎসব আরম্ভ করিল।

সতীরাণী দময়ন্তীর সতীত্ব-কথা ভারতের ঘরে ঘরে ঘোষিত হইল। তাঁহার এই কীর্ত্তি চিরদিন অম্লান ও উজ্জ্বল থাকিবে। আর্য্যনারী চিরদিন এই পুণ্যকথা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিবেন।

চিন্তা

শ্রীবৎস প্রাগ্‌দেশের রাজা। চিন্তা তাঁহার পরম সাধ্বী পত্নী। দময়ন্তীর মত ইহাকেও স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যাইতে হইয়াছিল, এবং স্বামীর সঙ্গ ছাড়া হইয়া অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগের পর সতীত্ব ও ধৈর্য্যবলে আবার স্বামীকে পাইয়া সুখশান্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

এক দিন স্বর্গে শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, কে বড়? কিছুতেই এই বিবাদের মীমাংসা হয় না। লক্ষ্মী বলেন, "আমি বড়"। শনি ঠাকুর বলেন, "আমি বড়।" অবশেষে স্থির হইল, পৃথিবীতে পুণ্যাত্মা শ্রীবৎসরাজের নিকট যাইয়া তাঁহারা এই বিবাদের মীমাংসা করিবেন। শ্রীবৎস যাঁহাকে বড় বলিবেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই বড়।

লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই শ্রীবৎসের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৎস তাঁহাদের বিবাদের কথা শুনিয়া বড়ই সমস্যায় পড়িলেন। এখন কাহাকে বড় আর কাহাকেই বা ছোট বলিবেন? লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট

হইলে রাজ্যের আর মঙ্গল নাই, শনি অসন্তুষ্ট হইলেও বিপদের অন্ত থাকিবে না। তিনি তাঁহাদিগকে পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন।

চিন্তা স্বামীর মুখে লক্ষ্মী ও শনির বিবাদের কথা শুনিয়া ভাবনায় পড়িলেন। কি উপায়ে এই বিবাদের মীমাংসা করা যায়? অবশেষে তিনি স্বামীকে বলিলেন, "মহারাজ, এক কৌশল করুন, একখানি সোণার ও আর একখানি রূপার সিংহাসন রাজসভায় রাখিয়া দিন, লক্ষ্মী ও শনি আসিয়া সেই সিংহাসনে বসিবেন। যিনি সোণার সিংহাসনে বসিবেন, তিনিই বড় হইবেন। এই প্রকার কৌশল করিলে তাঁহাদের বিচার তাঁহারাই করিয়া লইবেন, আপনাকে কোনও পক্ষেই মতামত দিতে হইবে না।" বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কথায় মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই কৌশলই অবলম্বন করিলেন। পরদিন লক্ষ্মী ও শনি আসিবার পূর্ব্বেই একখানি সোণার ও একখানি রূপার সিংহাসন রাজসভায় রাখা হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্মী ও শনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৎস তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সেই সিংহাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মী যাইয়া সোণার সিংহাসনে এবং শনি রূপার সিংহাসনে বসিলেন। শনি কহিলেন, "মহারাজ, এখন আমাদের বিচার আরম্ভ হউক।"

শ্রীবৎস বলিলেন, "আমি আর আপনাদের বিবাদের কি মীমাংসা করিব? আপনারাই ত নিজে নিজে মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন। আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে।" এই কথায় শনিদেব নিজকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ-হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। এখন তিনি মহারাজ শ্রীবৎসকে এই আপমানের প্রতি-শোধ দেওয়ার ছল খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীবৎস না জানিয়া কুকুরের উচ্ছিষ্ট জলে স্নান করিয়াছিলেন, শনিদেব এই সূত্র ধরিয়া তাঁহার রাজ্যে নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিলেন। সহসা রাজ্যে ঝড় বৃষ্টি, ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাত হইয়া বাড়ী ও বৃক্ষাদি ধ্বংস হইতে লাগিল, প্রজাদিগের দুঃখের আর সীমা রহিল না। শ্রীবৎস বুঝিতে পারিলেন, শনির কোপেই তাঁহার রাজ্যে এই প্রকার অমঙ্গল হইতেছে। প্রজাদের দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি দেশের রাজা, তাঁহার অপরাধেই প্রজারা এইরূপ কষ্ট পাইতেছে, সুতরাং তিনি যদি রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান, তবে শনিদেব আর রাজ্যের উপর কোনও অত্যাচার করিবেন না, প্রজারাও কষ্টের হাত হইতে নিস্তার পাইবে। তিনি রাণী চিন্তাকে কহিলেন, "প্রিয়ে, আমার উপর শনির কোপে প্রজাগণ দুঃখ পাইতেছে, তোমারও কষ্টের

শেষ নাই। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি এই সময় যাইয়া তোমার পিতার গৃহে বাস কর, সুসময় উপস্থিত হইলে আবার আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হইব।"

স্বামীর কথা শুনিয়া চিন্তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিলেন, "আপনি এ কি বলিতেছেন, মহারাজ? আপনি আমার পরম দেবতা স্বামী, আপনি বনবাসে যাইবেন আর আমি আপনার স্ত্রী হইয়া পিতার ঘরে যাইয়া শান্তিতে কাল কাটাইব? কিছুতেই আমি তাহা পারিব না। শাস্ত্রে বলে, স্ত্রী স্বামীর চির-সঙ্গিনী, কি গৃহে, কি অরণ্যে, সুখে দুঃখে সকল সময় স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; পতি-সেবাই নারীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম, তাহাদের আর অন্য ধর্ম্ম নাই। আপনাকে আমি একাকী বনে যাইতে দিব না, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব, আমি সঙ্গে থাকিলে আপনার বনবাসকষ্ট অনেকটা লাঘব হইবে। আপনার সঙ্গে থাকিলে আমার বনবাসও গৃহবাস অপেক্ষা অধিকতর শান্তিময় হইবে।" চিন্তার দুই চক্ষু বহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীবৎস আর তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। চিন্তা স্বামীর সঙ্গে মনের আনন্দে বনবাসে চলিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক নিবিড় নিস্তব্ধ। চিন্তা স্বামীর হাত ধরিয়া রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেবল আকাশের নক্ষত্রগুলি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রাজনন্দিনী, রাজরাণী চিন্তা পদে পদে আঘাত পাইতে লাগিলেন, বনের কাঁটা ও ঘাসের অঙ্কুরে তাঁহার কোমল চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ব্যথাকে তিনি ব্যথা বলিয়াই মনে করিলেন না, মনের আনন্দে হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সম্বলের মধ্যে মণিমুক্তার একটী পুঁটলি মাত্র।

বনের মধ্যে আসিয়া তাঁহারা একটা নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন। একজন পাটনী একখানা ছোট ভাঙ্গা নৌকা লইয়া ঘাটে বসিয়া আছে। রাজারাণী নদী পার হইতে চাহিলে সে বলিল, তাহার ছোট নৌকা একবারে একজন ছাড়া দুই জনের পার হওয়া সম্ভব হইবে না। তাঁহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া যেমন মণিমুক্তার পুঁটলিটি নৌকার উপর রাখিলেন, অমনি সেই নদী, নৌকা, মাঝী সমস্তই সেই পুঁটলিসহ অদৃশ্য হইয়া গেল। রাজারাণী বুঝিতে পারিলেন, ইহা শনির চক্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সেখান হইতে তাঁহারা চিত্রধ্বজ নামক বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ফলমূল খাইয়া তাঁহাদের দিন

কাটিতে লাগিল। রাজা শ্রীবৎস শুনিয়াছিলেন শোল মাছ পোড়া খাইলে শনির দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। একদিন তিনি ধীবর দিগের নিকট হইতে একটী শোলমাছ চাহিয়া লইয়া রাণীকে তাহা পোড়াইতে দিলেন। রাণী ভাবিতে লাগিলেন, হায়, একদিন নানা প্রকার সুখাদ্য ব্যঞ্জনেও যাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না, তিনি তাঁহাকে কিরূপে পোড়া মাছ খাইতে দিবেন? যাহা হউক, চিন্তা মাছটা পোড়াইয়া নিকটেই একটা পুকুরে তাহা ধুইবার জন্য লইয়া গেলেন। মাছটা জলে দিবা মাত্র তাহা এক লাফ দিয়া গভীর জলে পলাইয়া গেল। রাণী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, পোড়া মাছ জীবন পাইয়া পলাইয়া যায়, এমন কথা জীবনে কখনও তিনি শোনেন নাই, কাহাকে বলিলেও বিশ্বাস করিবে না। স্বামী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, তাঁহাকেই বা এখন কি খাইতে দিবেন? তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রাজাকে যাইয়া এই সংবাদ দিলেন। শ্রীবৎস হাসিয়া কহিলেন, "এই জন্য দুঃখিত বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই চিন্তা, সমস্তই শনির চক্রান্ত। দেবতাদের চক্রান্তে আরও বেশী অদ্ভুত কার্য্য হইয়া থাকে।"

রাজারাণী নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন একদল কাঠুরিয়ার দেখা পাইলেন। তাহাদের সহিত শ্রীবৎসের খুব বন্ধুত্ব হইল। কাঠুরিয়াদের পরামর্শে

তিনিও বন হইতে কাঠ কাটিয়া নগরে লইয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন! ইহাতে যে সামান্য আয় হইত তাহাতে রাজারাণী উভয়ের এক রকমে দিন চলিয়া যাইত। তরিতরকারী শাকপাতা যাহাই চিন্তা রন্ধন করিতেন, তাহাই যেন অমৃতের মত সুস্বাদু হইত। শ্রীবৎস মধ্যে মধ্যে বন্ধু কাঠুরিয়াদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন. তাহারা লক্ষ্মীরূপিণী চিন্তার হাতের রান্না খাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। এইরূপে সেই বনে কাঠুরিয়াদের সঙ্গে শ্রীবৎস ও চিন্তা দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন এক বিদেশী বণিকের নৌকা আসিয়া সেই কাঠুরিয়াদের ঘাটে আটকাইয়া গেল। অনেক চেষ্টাতেও আর নৌকা চলিল না, বণিক মহা বিপদে পড়িল। শনিদেব দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেশে সেই নৌকার নিকট যাইয়া বলিলেন, "এই কাঠুরিয়াদের ঘরে একজন পতিব্রতা স্ত্রীলোক আছেন, যদি তাঁহার দ্বারা নৌকা স্পর্শ করাইতে পার, তবেই তোমার নৌকা চলিবে।" বণিক এই কথায় একে একে সমস্ত কাঠুরিয়া স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নৌকা স্পর্শ করাইল, কিন্তু নৌকা নড়িল না। বণিক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল, একজন স্ত্রীলোক তখনও আসেন নাই। তিনিই শ্রীবৎস রাজার মহিষী চিন্তা। বণিক তাঁহার কাছে যাইয়া অনেক প্রকার স্তবস্তুতি করিল, কিন্তু স্বামী তখন ঘরে না থাকায়

তিনি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বণিক তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বণিকের ক্রন্দনে চিন্তার প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর অনুমতি না লইয়াই নৌকা স্পর্শ করিতে চলিলেন। সতী সাধ্বীর স্পর্শমাত্র নৌকা ভাসিয়া উঠিল। বণিক বিস্মিত হইয়া গেল। পাপিষ্ঠ মনে করিল, ইঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলে আর কখনও নৌকা আট্‌কাইবার ভয় থাকিবে না। এই মনে করিয়া সে চিন্তাকে বল পূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া লইল। এই বিপদে চিন্তা কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তাঁহার ক্রন্দন চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু পাপাত্মা বণিকের হৃদয় বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। চিন্তা নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "রূপই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের কারণ, রূপহীনার কোনও ভয় নাই। তখন তিনি সূর্য্যদেবের স্তব করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে সূর্য্যদেব, আপনি আমাকে কুৎসিৎ জঘন্য শরীর দান করুন, শরীরে দুর্গন্ধময় গলিত কুষ্ঠ ব্যাধির আবির্ভাব হউক, যখন আমার প্রয়োজন হইবে, তখন যেন আমি আবার আপনার নিকট হইতে আমার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাই। সতী সাধ্বীর প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না। সূর্য্যদেবের দয়ায় চিন্তার দেহ বিশ্রী হইয়া গেল, কুষ্ঠব্যাধিতে শরীর পচিয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে শ্রীবৎস গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কুটীর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, চিন্তা নাই। চিন্তাকে না দেখিয়া তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসিনী কাঠুরিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বণিক কর্ত্তৃক চিন্তার হরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই শনির চক্রান্ত। অতঃপর চিন্তার অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীবৎস যাইয়া গো-মাতা সুরভীর চিত্তানন্দ নামক তপোবনে উপস্থিত হইলেন। দেবী সুরভী তাঁহার নিকট সমুদয় কথা শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর, এখানে শনির কোপ প্রবেশ করিতে পারে না। তোমার এই দুঃসময় চলিয়া গেলেই আবার রাজ্য ও স্ত্রী ফিরিয়া পাইবে।"

রাজা সুরভীর সুমধুর দুগ্ধ পান করিয়া সেই আশ্রমে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীবৎস তালবেতাল সিদ্ধ ছিলেন। এই যক্ষদ্বয়কে তিনি যাহা করিতে বলিতেন তাহারা তাহাই করিয়া দিত। শ্রীবৎস এইবার তালবেতালকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে সুরভীর দুগ্ধে মাটি ছানিয়া সোণার ইষ্টক প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বহু সোণার ইষ্টক প্রস্তুত হইল। অবশেষে তিনি সেগুলি কোনও বন্দরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার জন্য এক বণিকের নৌকা ডাকিলেন। চিন্তাকে যে বণিক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল ঘটনাক্রমে সেই বণিকের

নৌকাই উপস্থিত হইল। শ্রীবৎসও সোনার ইষ্টক লইয়া সেই নৌকায় উঠিলেন। সোনার ইষ্টক দেখিয়া বণিকের খুব লোভ হইল। সে মনে করিল, "যদি ইঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারি তবে এই ইষ্টকগুলি আমারই হইবে।" এই মনে করিয়া দুরাত্মা বণিক শ্রীবৎসকে ঠেলিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। রাজা জলে পড়িয়া চিন্তা ও তাল-বেতালকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চিন্তাদেবী সেই নৌকায় অন্য একটী ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, স্বামীর ক্রন্দন শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটী বালিশ জলে ফেলিয়া দিলেন। তালবেতাল ভেলা হইয়া শ্রীবৎসের নিকট ভাসিয়া আসিল। রাজা সেই ভেলার উপর বালিশ মাথায় দিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভাসিয়া ভাসিয়া সুবাহু রাজার রাজ্যে রম্ভাবতী মালিনীর ঘাটে গিয়া উঠিলেন। রম্ভাবতী তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া পরম যত্নে সেবা শুশ্রূষা করিয়া খাইতে দিল। রাজা সেই মালিনীর বাড়ীতে বাস করিয়া নারায়ণের পূজা করিতে লাগিলেন।

সুবাহু রাজার কন্যা ভদ্রাবতী। তিনি লোক মুখে পুণ্যাত্মা শ্রীবৎস রাজার কথা শুনিয়া তাঁহাকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, আজ তাঁহার স্বয়ম্বর, নানাদেশ-দেশান্তর হইতে রাজারা ভদ্রাবতী লাভের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। উৎসবের আনন্দে রাজধানী ভরিয়া গিয়াছে। রাজা শ্রীবৎস অতি

দীনবেশে অদূরে একটা কদম গাছের তলায় বসিয়া স্বয়ম্বর দেখিতেছেন। ভদ্রা সখীদিগের সঙ্গে বর-মাল্য হস্তে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিলেন। একে একে উপস্থিত রাজগণের পরিচয় দেওয়া হইল, কিন্তু ভদ্রা যাঁহাকে এতদিন স্বামী বলিয়া ধ্যান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন দৈববাণী হইল ঃ—

"কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার জন্য তপ কৈলা দ্বাদশ বৎসর ॥"

দৈববাণী শুনিয়া ভদ্রা আনন্দিত মনে সেই গাছের নীচে যাইয়া দরিদ্রবেশধারী শ্রীবৎসকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। একজন সামান্য পথের ভিক্ষুককে বরণ করিতে দেখিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় সকলের মুখ হেঁট হইয়া গেল। সকলেই ভদ্রাকে ভৎসনা ও উপহাস করিতে লাগিল। কন্যার এই ব্যবহারে মহারাজ সুবাহু ও মহারাণী প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন। ভদ্রার দ্বারা লোকসমাজে তাঁহাদের মুখ ছোট হইয়া গেল, কুলে কলঙ্ক পড়িল, দেশে দেশে দুর্ণাম রটিল ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাঁহারা শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জীবনে আর কন্যার মুখ দেখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। জামাতা ও কন্যার আর রাজবাটীতে স্থান হইল না। রাজবাটীর বাহিরে তাঁহাদের

থাকিবার জন্য একখানি ছোট ঘর নির্ম্মিত হইল, সাধ্বী ভদ্রা তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইলেন না; স্বামীর সহিত পরম সুখে ও শান্তিতে সেই ঘরেই বাস করিতে লাগিলেন।

রাজা সুবাহু সমুদ্র দিয়া যে সকল নৌকা যাতায়াত করে তাহা পরীক্ষা করা এবং কর আদায় করার কার্য্যে শ্রীবৎসকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীবৎস আনন্দিত মনে তাহাই করিতে লাগিলেন। যে বণিক চিন্তাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিল এবং শ্রীবৎসের সোনার ইট লইয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, একদিন তাহার নৌকা আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। শ্রীবৎস নৌকা দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তাঁহার আদেশে অনুচরেরা নৌকা আটক করিয়া সমস্ত জিনিষ উপরে তুলিল। সেই সোনার ইষ্টক গুলিও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। বণিক কিন্তু শ্রীবৎসকে চিনিতে পারিল না। ইনি সুবাহু রাজার জামাতা, এইমাত্র সে পরিচয় পাইল। বণিক ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা সুবাহুর নিকট নালিস করিল, তাঁহার অনুচরেরা বিনা অপরাধে তাহার সমস্ত জিনিষপত্র লুটিয়া লইয়াছে। রাজা শ্রীবৎসের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সমস্ত জিনিষ ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শ্রীবৎস বলিলেন, "মহারাজ, এ বণিক একজন চোর, এখনই আপনি ইহার পরিচয় পাইবেন। এই যে সোনার ইষ্টক-

গুলি বণিকের নৌকা হইতে বাহির হইয়াছে, ঐগুলি উহার নহে, অন্য কাহারও সম্পত্তি চুরি করিয়া লইয়া আনিয়াছে।”

সুবাহু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা কিরূপে বুঝিব ?”

শ্রীবৎস উত্তর করিলেন, “বণিক যদি ঐ সোনার ইষ্টকগুলির জোড় খুলিয়া দিতে না পারে তবেই বুঝিবেন যে ঐগুলি তাহার নিজস্ব নহে।

রাজা বণিককে ইষ্টকের জোড় খুলিয়া দিতে বলিলেন। বণিক বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা করিতে পারিল না। শ্রীবৎস সুবাহুকে বলিলেন, “দেখিলেন মহারাজ, বণিক জোড় খুলিতে পারিল না, এখন দেখুন আমি অনায়াসে উহা খুলিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি একে একে সমস্ত সোনার ইষ্টকগুলির জোড় খুলিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। রাজা সুবাহু তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জামাতা একজন সাধারণ মানুষ নহেন। তিনি সকলের সম্মুখে করজোড়ে শ্রীবৎসকে কহিলেন, “মহাশয়, আপনি কে, আমাকে সত্য পরিচয় দিন। আপনি নিশ্চয়ই কোনও ছদ্মবেশী দেবতা, ভদ্রাবতী গ্রহণের জন্য এখানে আসিয়াছেন। আপনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ, তাহা না হইলে আমার পুণ্যবতী কন্যা ভদ্রার সহিত কিছুতেই আপনার বিবাহ হইতে পারিত না। দয়া করিয়া আপনার সত্য পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আমার সন্দেহ দূর করুন।”

শ্রীবৎস তখন তাঁহার পরিচয় এবং শনির কোপের কথা বলিলেন। সুবাহু তাঁহার পরিচয় পাইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অজ্ঞানতা বশতঃ আপনার প্রতি নানপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি। কন্যা ভদ্রাবতীরদ্বারা আজ আমার কুল পবিত্র হইল। সে উপযুক্ত পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলেই আজ আপনার সহিত আমার এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।"

শ্রীবৎসও অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনি আমার পূজণীয় ব্যক্তি, আমাকে ঐ রূপ বলিয়া পাপভাগী করিবেন না। চিন্তাদেবী এই পাপিষ্ঠ বণিকের নৌকায় বন্দিনী হইয়া আছেন, শীঘ্র তাঁহাকে উদ্ধার করুন।"

তখনই রাজা সুবাহু চিন্তাকে উদ্ধার করিবার জন্য চতুর্দ্দোলা লইয়া বণিকের নৌকায় গেলেন। চিন্তার কুৎসিত রূপ এবং ব্যাধিগ্রস্থ শরীর দেখিয়া সুবাহু কহিলেন, "মা, শুনিয়াছি তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী, তবে তোমার এই অবস্থা কেন? তোমার স্বামী শ্রীবৎস এ দেশের রাজা হইয়াছেন, তোমার দুঃখ দূর হইয়াছে, আমি তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট লইয়া যাইতে আসিয়াছি, এস মা, দোলা প্রস্তুত, দোলায় উঠিয়া স্বামী দর্শনে চল।"

চিন্তা সহসা এই আনন্দ সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইয়া অতি নম্রভাবে কহিলেন, "আমাকে দুষ্ট বণিক নৌকায়

তুলিয়া লইলে, আমি আত্মরক্ষার জন্য সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই ব্যাধি এবং কুৎসিত রূপ লাভ করিয়াছি। আবার যখন আবশ্যক হইবে পূর্ব্বের রূপ লাভ করিতে পারিব। স্বামীর নিকট যাইতে আমার দোলার আবশ্যক নাই, আমি হাঁটিয়াই তাঁহার চরণ-দর্শনে যাইতে পারিব।"

চিন্তাদেবী পায়ে হাঁটিয়াই আনন্দিত মনে স্বামীর নিকট চলিলেন। বহু দিন বহু কষ্টের পরে আবার শ্রীবৎসচিন্তার মিলন হইল। চিন্তা শ্রীবৎসকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। তারপর সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তিনি আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও রূপ ফিরিয়া পাইলেন।

রাজা সুবাহু শ্রীবৎসকে তাঁহার রাজ্য দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীবৎস কিছুতেই তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন সুবাহু ভদ্রাবতীর সহিত বহু ধনরত্ন ও দাসদাসী দিয়া জামাতাকে তাঁহার রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীবৎস, চিন্তা ও ভদ্রাবতী রথে চড়িয়া নিজ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথে শনিদেব শূন্য হইতে শ্রীবৎসকে বলিলেন, "আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তুমি ও তোমার স্ত্রী এই দারুণ কষ্টের মধ্যেও ধর্ম্ম ভুলিয়া যাও নাই। তোমার সেই ধৈর্য্য এবং তোমার পতিব্রতা পত্নী চিন্তার সতীত্বগুণে আমি তোমাদের প্রতি

ক্রোধ পরিত্যাগ করিলাম। যাহারা তোমাদের নাম স্মরণ করিবে, তাহারাও কোনদিন আমার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িবে না। তোমরা নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইয়া সুখে শান্তিতে রাজত্ব কর।”

রাজা শ্রীবৎস নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহারা যেন বহুদিনের হারাণো রত্ন আবার ফিরিয়া পাইল। সমস্ত রাজ্যে উৎসব আরম্ভ হইল। রাজা শ্রীবৎস চিন্তা ও ভদ্রাবতীর সহিত বহু বৎসর সুখে রাজত্ব করিলেন। তাঁহার শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগযজ্ঞ এবং নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম্ম করিয়া অবশেষে মহারাজ শ্রীবৎস পতিব্রতা পত্নী চিন্তাদেবীর সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। জগতে তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

অনসূয়া

ইনি মহর্ষি অত্রির পত্নী। স্বামি সেবায়, দয়ায়, দানে, জ্ঞানে, তপস্যায় ও পরোপকারব্রতে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা ছিলেন। দক্ষিণাপথে কামদবনে মহর্ষি অত্রি সাধ্বী পত্নী অনসূয়ার সহিত বাস করিয়া তপস্যা করিতেন। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় এই বনে ভয়ানক জলকষ্ট আরম্ভ হইল। তারপর গাছপালা শুকাইয়া গেল, খাদ্যের অভাব দেখা দিল, প্রাণিগণের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। দয়াবতী অনসূয়া জীবদিগের এই দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, হৃদয় তাঁহার কাঁদিয়া উঠিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন, "প্রাণিগণের এই কষ্ট আর সহ্য হয় না, শীঘ্র ইহার উপায় করুন।"

মহর্ষি অত্রি দেবতাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনসূয়াও একটি শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা এবং স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি শিব ও স্বামিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। কঠোর তপস্যায় বহুদিন গত হইল। অত্রির শিষ্যেরা অনাহার এবং জলকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া

অন্য স্থানে চলিয়া গেল। অত্রি এবং অনসূয়ার কঠোর তপস্যা দেখিয়া মহাদেব এবং গঙ্গাদেবী পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দেবতারা বলিতে লাগিলেন, অত্রি এবং অনসূয়ার মধ্যে কাহার তপস্যা শ্রেষ্ঠ? উভয়ের তপস্যার তুলনা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দেবী অনসূয়ার তপস্যাই বেশী কঠোর।

বহু বৎসর গত হইলে অত্রির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি অনসূয়ার নিকট জল চাহিলেন। তখনও বৃষ্টি হয় নাই, চারিদিক একেবারে জ্বলিয়া গিয়াছে। জলের লেশমাত্রও কোথায়ও নাই, অথচ স্বামী জল চাহিয়াছেন, অনসূয়া ভাবিতে লাগিলেন, জল কোথায় পাইবেন? কি প্রকারে তৃষ্ণা দূর করিবেন? তিনি কমণ্ডলু লইয়া বনের ভিতর জল অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। অনসূয়া চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছেন, হঠাৎ এক দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "সতি, আমি তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, বল তোমার কি উপকার করিতে হইবে?"

অনসূয়া কহিলেন, "দেবি, আপনি কে?"

দেবী উত্তর করিলেন, "আমি গঙ্গা, তোমার স্বামিসেবা ও শিবপূজায় বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। যাহা ইচ্ছা বর চাও।"

অনসূয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দেবি,

যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার তৃষ্ণার্ত্ত স্বামীকে একটু জলদান করুন।"

গঙ্গাদেবী অনসূয়াকে একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে বলিলেন। অনসূয়া গর্ত্ত খুঁড়িলে গঙ্গাদেবী তাহাতে প্রবেশ করিলেন, গর্ত্ত নির্ম্মল জলে ভরিয়া গেল। অনসূয়া কমণ্ডলু ভরিয়া সেই জল আনিয়া স্বামীকে দিলেন। মহর্ষি অত্রি সুমধুর জল পান করিয়া বিস্মিত হইলেন, এমন সুস্বাদু জল ত তিনি কখনও পান করেন নাই! চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও বৃষ্টি হয় নাই। অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে, দেখিতেছি পৃথিবী এখনও জলের অভাবে শুষ্ক, তবে তুমি এমন মধুর জল কোথায় পাইলে?"

অনসূয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "গঙ্গাদেবী আমাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই বনে আসিয়াছেন। তিনিই দয়া করিয়া আমাকে এই জল দিয়াছেন।"

অত্রি বলিলেন, "তুমি আমাকে গঙ্গাদেবীকে দেখাইতে পার?"

সাধ্বী অনসূয়া তখন স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সেই কূপের কাছে গেলেন। অত্রি সুন্দর জলে ভরা কূপ দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সেই জলে স্নান পূজা করিয়া গঙ্গাস্তব করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাদেবী তখন আবির্ভূতা হইয়া অনসূয়াকে কহিলেন,

"দেবি, তোমার মনেবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আমি চলিলাম।"

অনসূয়া বলিলেন, "যদি আমার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে লোকের উপকারের জন্য আপনি দয়া করিয়া এই বনে বাস করুন।"

গঙ্গাদেবী কহিলেন, "অনসূয়া, যদি তুমি তোমার এক বৎসরের স্বামিসেবা ও শিবপূজার ফল আমাকে দিতে পার, তবে আমি এই বনে থাকিতে পারি। পতিব্রতা নারী দেখিলে আমি যেমন আনন্দিত হই, তেমন আর কিছুতেই হইনা। সতী রমণী দেখিলে আমারও পুণ্য লাভ হয়। তোমার স্বামিসেবা সত্য সত্যই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।"

লোকের উপকারের জন্য অনসূয়ার প্রাণ কাঁদিতে-ছিল। তিনি তাঁহার একবৎসরের পুণ্য দান করিয়া পরোপকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। গঙ্গাদেবী সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। দেবতারাও অত্রি এবং অনসূয়ার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কামদবন বৃষ্টির জল পাইয়া আবার ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিল, চারিদিকে প্রচুর শস্য জন্মিল। সতী সাধ্বী অনসূয়ার পুণ্যফলে লোকে আবার পেট ভরিয়া খাইয়া সুখী হইল, জগতের হাহাকার ঘুচিল।

একদিন মহামুনি মাণ্ডব্য কৌশিক ঋষিকে অভিসম্পাত

দিয়াছিলেন,—'সূর্য্যোদয় হইলেই যেন তোমার মৃত্যু হয়।' কৌশিকের স্ত্রী পতিব্রতা এই অভিসম্পাত হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, "আমি যদি সাধ্বী হই, আমার স্বামিসেবা যদি সার্থক হইয়া থাকে, তবে আর যেন সূর্য্য উদিত না হন।" পতিব্রতার প্রার্থনা সূর্য্যদেব অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

সূর্য্যের অভাবে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া গেল। সূর্য্যের কিরণ না পাইলে পৃথিবী নষ্ট হইয়া যায়। দেবতারা ভয় পাইয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "সতীর অভিসম্পাতে যখন এইরূপ হইয়াছে, তখন ইহার প্রতীকার করিতে পারিবেন একমাত্র মহর্ষি অত্রির পতিপ্রাণা পত্নী অনসূয়া। তোমরা তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

দেবতারা অনসূয়ার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সমুদয় নিবেদন করিলেন। অনসূয়া বলিলেন, "পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইতে পারিবে না। যাহা হউক, যাহাতে পতিব্রতার স্বামীর জীবন রক্ষা হয়, এবং সূর্য্যদেবও উদিত হন আমি তাহাই করিব।" এই বলিয়া তিনি কৌশিক ঋষির আশ্রমে যাইয়া পতিব্রতাকে কহিলেন, "সতি, পতি-সেবা দ্বারা তুমি সূর্য্যের উদয় রহিত করিতে পারিয়াছ, আমিও কেবল স্বামিসেবা দ্বারাই মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। পুরুষদিগকে পুণ্যলাভ করিতে হইলে বহু

প্রকার সৎকার্য্য করিতে হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক একমাত্র স্বামি-সেবা করিয়াই স্বামীর অর্দ্ধেক পুণ্যের অংশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের অন্য কোনও যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসের প্রয়োজন নাই, স্বামিসেবাই নারীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম, স্বামীই আমাদের একমাত্র দেবতা। তোমার অভিসম্পাতে সূর্য্য উদিত হইতে না পারায় পৃথিবী নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। অতএব তুমি দয়া করিয়া সূর্য্যদেবকে অভিশাপ হইতে মুক্ত কর।”

পতিব্রতা কহিলেন, “দেবি, সূর্য্য উঠিলেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে। স্বামীর জীবন রক্ষার জন্যই আমি সূর্য্যের উদয় বন্ধ করিয়াছি।”

অনসূয়া বলিলেন, “তুমি সূর্য্যদেবকে উদিত হইতে অনুমতি দাও, আমি আমার পুণ্যবলে তোমার স্বামীর জীবন দান করিব।”

পতিব্রতা অনসূয়ার কথায় আশ্বস্ত হইয়া সূর্য্যকে উদিত হইতে অনুমতি দিলেন। সূর্য্য উদিত হইবামাত্র কৌশিক ঋষির প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। পতিব্রতা স্বামি-শোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, “সতি, তুমি কাতর হইও না, আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা স্মরণ কর। আমি যদি কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবা করিয়া থাকি, কোনও মানুষকে,—এমন কি

কোনও দেবতাকে পর্য্যন্ত যদি আমি আমার স্বামী অপেক্ষা কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে না ভাবিয়া থাকি, তবে আমার সেই পুণ্যের ফলে তোমার স্বামী পুনর্জ্জীবন এবং নূতন শরীর ধারণ করিয়া শত বৎসর তোমার সহিত সুখে বাস করুন।” অনসূয়ার কথা শেষ হইতে না হইতেই কৌশিকঋষি জীবন লাভ করিলেন, তাঁহার বার্দ্ধক্য দূর হইয়া শরীর যৌবনের নূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। অনসূয়ার পতিপূজার তেজ দেখিয়া দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বাকপুষ্টা

কাশ্মীর রাজ্য মর্ত্ত্যের স্বর্গ। চারিদিকে পাহাড়, গাছ, ঝরণা, লতা, পাতা, ফুল, সবুজ শস্যের ক্ষেত; ঝোপে ঝোপে পাখীদের মধুর গান। স্বর্গের সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর পরিপূর্ণ, সে সৌন্দর্য্যের শেষ নাই, এই জন্য বলা হয়,—কাশ্মীরে চির বসন্ত বিরাজিত। এই স্থানের লোকেরাও যেমন সুন্দর, তেমনই বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সকলেরই মুখে যেন ডালিমের ন্যায় লাল আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় না, জীবনে তাহারা কোনও দিন দুঃখের মুখ দেখিয়াছে।

এই কাশ্মীর রাজ্যে পূর্ব্বকালে তুঞ্জিন নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন, তিনি যেমন বীর, তেমনই দয়াশীল। প্রজাদিগকে তিনি নিজের সন্তানের মত ভালবাসিতেন। দেবী বাক্‌পুষ্টা তাঁহারই উপযুক্ত মহিষী। তিনি রাজ্যের ভাল মন্দ, এবং প্রজাদের সুখ দুঃখও স্বামীর সহিত সমান-ভাবে আলোচনা করিতেন। স্বামীর সঙ্গে সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া তিনিও রাজ্যের সমস্ত সংবাদ লইতেন। রাজা তুঞ্জিন রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে এই গুণবতী

মহিষীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। স্ত্রীকে যে জন্য সহধর্ম্মিনী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হয়, রাণী বাকপুষ্টা সত্যসত্যই সেই সমস্ত গুণে ভূষিতা ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে কাশ্মীর রাজ্যের সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী বলিয়া মনে করিত।

শরৎ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাশ্মীরের ক্ষেত্র সকল অর্দ্ধ পক্ক শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিতেছে। কৃষক-গণের মনে আনন্দ ধরে না, কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার তাহারা শীঘ্রই ঘরে তুলিবে, এই আশায় তাহাদের হৃদয়ে কত সুখের কল্পনা ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হায়, মানুষ ভাবে একপ্রকার ঘটে অন্যপ্রকার। হেমন্তের প্রথমেই চারিদিকে এমন তুষার পড়িতে আরম্ভ করিল যে, গাছপালা, শস্যের ক্ষেত সমস্তই সাদা হইয়া গেল। সোণার বরণ ধানের ক্ষেত বরফের নীচে চাপা পড়িল। কৃষকেরা এক কণা শস্যও ঘরে তুলিতে পারিল না, তাহাদের সমস্ত আশা ভরসাই ফুরাইয়া গেল। তারপর দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল,—ভীষণ দুর্ভিক্ষ! লোকে গাছের পাতা খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। গাছের পাতাও শেষে আর জুটিল না, পেটের জ্বালায় মাতাপিতা পুত্রকন্যা বেচিতে লাগিল। কিন্তু কিনিবে কে? পচা দুর্গন্ধ অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া মহামারী দেখা দিল, দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। যে যেখানে মরে, সে সেইখানেই পড়িয়া থাকে, মৃতদেহের সৎকার হয় না। পচা মড়ার দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস

ভরিয়া গেল। মানুষেরা শৃগাল কুকুরের সঙ্গে মিশিয়া পচা মড়ার মাংস খাইতে লাগিল। মর্ত্ত্যের স্বর্গ কাশ্মীর একেবারে নরক হইয়া পড়িল।

প্রজাদের দুঃখে রাজারাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিরূপে প্রজাদের কষ্ট দূর করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহাদের মুখে অন্ন ওঠে না, চোখে নিদ্রা আসে না। তাঁহারা রাজ্যের এক দিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঔষধ ও অন্নবস্ত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাণী বাকপুষ্টা মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার মত কুটীরে কুটীরে গিয়া ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন এবং পীড়িতকে ঔষধ পথ্য দিয়া মধুর বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রজা-দিগের গগনভেদী হাহাকারের মধ্যে তাঁহার সান্ত্বনার বাণী যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে অল্প-দিনেই রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল, দয়াবতী বাকপুষ্টা তাঁহার সামান্য অলঙ্কারখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রজা-দিগের ক্ষুধা মিটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী একত্র মিলিত হইয়া সোণার কাশ্মীরকে শ্মশানে পরিণত করিল।

ক্রমে অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। রাজারাণীর যতদূর সাধ্য তাঁহারা তাহা করিলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা দূর করিতে পারিলেন না। সর্ব্বত্রই প্রজারা ক্ষুধা ও ব্যাধির জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে লাগিল। শীত

আসিলে অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া পড়িল। প্রজাদের ক্রন্দনে রাজারাণীর চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। প্রজারা খাইতে পায় না, কিরূপে তাঁহারা মুখে গ্রাস তুলিবেন? তাঁহারা উপবাসী থাকিয়া রাজ্যের মঙ্গলের জন্য দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এসময় ভগবানও বুঝি বধির, প্রার্থনা তাঁহার কাণে পৌঁছিল না।

রাজা তুঞ্জিন যখন দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল, তাঁহার আকুল প্রার্থনা পর্য্যন্ত ভগবান শুনিলেন না, প্রজাদের আর কোনও উপকার তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে, তখন তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

সম্মুখে বিষের পাত্র লইয়া রাজা তুঞ্জিন বসিয়া ভগবানের চরণে শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর বিষের পাত্র মুখে ঢালিয়া দিবেন এমন সময় রাণী বাকপুষ্টা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীর হাতে বিষ দেখিয়া তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি রাজার হাত হইতে বিষপাত্র কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "এ আবার আপনার কি দুর্ম্মতি মহারাজ?"

তুঞ্জিন বলিলেন, "দুর্ম্মতি নয় রাণি, প্রজাদের দুঃখ আর সহ্য হয় না। রাজার পাপেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়।

রাজাই প্রজার রক্ষক, কিন্তু এই দুঃখের সময় আমি তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমার এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? তুমি আমাকে বাধা দিও না রাণি, আমি বিষ খাইয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব,—দেখি যদি আমার জীবনের বদলে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া আসে।”

বাকপুষ্টা বলিলেন, “মহারাজ, আত্মহত্যায় পাপ বাড়ে মাত্র, প্রায়শ্চিত্ত হয় না। দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য লোকে আত্মহত্যা করে বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার আত্মা শতগুণ বেশী যন্ত্রণা পায়। আত্মহত্যায় লোকের পৌরষ বৃদ্ধি পায় না, বরং মনের নীচতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি রাজা, আপনার জীবন আপনার নয়, ইহা প্রজার, সুতরাং আত্মহত্যায় আপনার অধিকার নাই। প্রজার জীবন রক্ষার জন্যই রাজার জীবনধারণ আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটী প্রজা জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহার জীবন রক্ষার জন্য আপনাকে চেষ্টা করিতে হইবে। মহারাজ, মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করুন, চলুন, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করি, ফল ভগবানের হাতে; যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া যদি সফল হইতে না পারি, সে দোষ আমাদের নহে। মহারাজ, আপনি শান্ত হউন, ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি যদি সতী হই,—যদি সত্যসত্যই ভগবানের প্রতি

আমার ভক্তি থাকে,—যদি প্রজার দুঃখে আমার প্রাণ বিন্দুমাত্রও কাঁদিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই ভগবান প্রজা-রক্ষার একটা ব্যবস্থা করিবেন।” বলিতে বলিতে বাকপুষ্টার মুখ একটা স্বর্গীয় আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল।

বাকপুষ্টার কথায় তুঞ্জিনের হৃদয়ে অনেকটা বলের সঞ্চার হইল। নিরাশার অন্ধকারে তিনি যেন আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। বাকপুষ্টা আহার নিদ্রা ভুলিয়া কেবল এক মনে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন কাটিয়া গেল, বাকপুষ্টার প্রার্থনা ও ক্রন্দনের বিরাম নাই। ভগবান আর এবার স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাকপুষ্টার ক্রন্দনে তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল। ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহা কখনও বিফল হয় না। প্রাতঃ-কালে সুর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাশ্মীর রাজ্যে আকাশ হইতে বৃষ্টিধারার মত মৃত পায়রা পড়িতে লাগিল। প্রজাদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। বহুদিন পরে তাহারা পায়রার মাংস পেট ভরিয়া খাইল। একদিন নয়, দুইদিন নয়, যে পর্য্যন্ত বরফ গলিয়া গিয়া কাশ্মীরের শস্য-ক্ষেত্র আবার শস্যে ভরিয়া না উঠিল, সে পর্য্যন্ত আকাশ হইতে অজস্রধারায় মৃত পায়রা পড়িতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ দূর হইল। প্রজাদের মুখে হাসি ফুটিল। কাশ্মীর-রাজ্য

আবার স্বর্গের শোভা ধারণ করিল। বাকপুষ্টার সতীত্ব, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরভক্তিতে কাশ্মীরের প্রজাগণ নূতন জীবন ফিরিয়া পাইল। তাহারা দলে দলে আসিয়া এই রাজলক্ষ্মীর চরণ-ধূলা মাথায় লইয়া ধন্য হইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে রাজা তুঞ্জিন চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন। সতী বাকপুষ্টা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সংবাদ পাইয়া দলে দলে দূর দূরান্তর হইতে প্রজারা তাঁহাদের জীবনদাত্রী রাজলক্ষ্মীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তাহাদের ক্রন্দনে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রাণী চিতার উপর হইতে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া হাসিমুখে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর দাউ দাউ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাপ্রাণা বাকপুষ্টা সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া স্বামীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। যেখানে তিনি স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, বহু যুগ-যুগান্তর পরে আজও সেইস্থান "বাকপুষ্টাটবী" নামে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি-কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

ক্ষমাবতী

বাঙ্গলাদেশের হিন্দুমুসলমান, স্ত্রীপুরুষ, ধনীনির্ধন সকলেই খনার বচনের সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে পরিচিত। বাঙ্গালী হাঁটিতে চলিতে, খাইতে শুইতে খনার বচন সাধ্যমত মানিয়া চলে। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে খনার বচন শাস্ত্রবচনের ন্যায় পালনীয়। খনার বচনের উপর তাহাদের বিশ্বাসও অগাধ; কৃষক শস্য বপনের সময় বিচার করিয়া দেখে সেই সময়টা খনার বচনে উত্তম সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিনা; বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময় গৃহস্থেরা খনার বচনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থান নির্দ্দেশ করে, খনার বচন মানিয়া যাত্রা করে, এক কথায় বাঙ্গালী গৃহস্থ তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই খনার বচনের আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা না হইলে যেন সে তৃপ্তি পায় না। খনা এমনই ভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। খনাদেবীর লিখিত নিয়ম বাঙ্গলাদেশে এত প্রচলিত যে, সামান্য বালক বালিকারাও তাঁহার দুই একটা মুখস্থ বলিতে পারে। তাঁহার সম্বন্ধে

নানা প্রকার সম্ভব অসম্ভব ঘটনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই খনারই অপর নাম ক্ষমাবতী।

খনার পিতা অটনাচার্য্য একজন প্রগাঢ় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। কাশ্মীর রাজ্যে শ্রীনগর নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি বাস করিতেন, সে আজ প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। খনা যখন মায়ের কোলের শিশু, তখনই তাঁহার মায়ের মৃত্যু হয়। অটনাচার্য্য মাতৃহীনা কন্যাকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। পিতার স্নেহ ও যত্নে শিশু মায়ের অভাব ভুলিয়া গেল। এই বালিকাই হইলেন অটনাচার্য্যের হৃদয়ের শান্তি, নয়নের অনন্দ, জীবনের নিত্যসঙ্গিনী। বালিকার ফুলের মত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তিনি জগতের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি যখন দূরবীক্ষণ-যন্ত্র হাতে লইয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকিতেন বালিকা তখন পিতার পার্শ্বে বসিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেন। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খনাও পিতাকে গ্রহনক্ষত্র বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, পিতা বিরক্ত না হইয়া আনন্দের সহিত বালিকার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ক্রমে খনারও জ্ঞানের পিপাসা বাড়িতে লাগিল, তিনি পিতাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহার মন সন্তুষ্ট না হইত ততক্ষণ তিনি পিতাকে

সুস্থির থাকিতে দিতেন না। শৈশব হইতেই জ্যোতিষ সম্বন্ধে একজন বড় পণ্ডিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এই জ্ঞানের তৃষ্ণাই কালে বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

খনার বয়স যখন এগার বৎসর তখনই তিনি পিতার নিকট ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য এবং বরাহমিহিরের পুস্তকগুলি পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে বালিকার তৃপ্তি হইল না। ঐ সম্বন্ধে আরও বেশী জানিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে প্রবল হইয়া উঠিল। অটনাচার্য্য কন্যার এইরূপ শিখিবার ইচ্ছা দেখিয়া তাহা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীনগরের ন্যায় ছোট একখানি গ্রামে থাকিয়া ঐরূপ কঠিন বিষয় আলোচনা অসম্ভব, সেইজন্য তিনি খনাকে লইয়া বিদ্যাচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান কাশীধামে চলিয়া আসিলেন।

কাশীধামে আসিয়া খনা তাঁহার মনের সাধ মিটাইয়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ পাইলেন। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন টোলে বড় বড় বিখ্যাত পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্র পড়াইতেন। নানা দেশ হইতে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাশীধামে যাইত। যদিও অটনাচার্য্য কেবল কন্যার শিক্ষার জন্যই কাশীধামে আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার যশ অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া কাশীতে পরিচিত

হইলেন, তখন দলে দলে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের জন্য শিষ্য আসিতে লাগিল। শীঘ্রই অটনাচার্য্যের টোল কাশীতে একটা বিখ্যাত টোলে পরিণত হইল। ছাত্র-দিগের সঙ্গে খনাও পিতার নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাস্ত্র-গুলি সবই পড়িয়া ফেলিলেন; কেবল মাত্র পড়া নহে, ঐ বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানলাভও হইল।

অটনাচার্য্যের একজন শিষ্যের নাম ছিল মিহির। তিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার নিকটে চন্দ্রপুর নামে একটী গ্রামে মিহিরের জন্ম হয়। এই চন্দ্রপুর তখন চন্দ্রকেতু নামে একজন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। তিনি স্বাধীন রাজা নহেন। মোগলের অধীন একজন করদ রাজা মাত্র। মিহির এই রাজার একজন আত্মীয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা দেশে নানা শাস্ত্র পড়িয়া আরও অধিক জ্ঞানলাভের জন্য কাশীধামে যাইয়া অটনাচার্য্যের শিষ্য হন। বৃদ্ধ আচার্য্য তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। মিহির ও খনা এক সঙ্গে পড়াশুনা করিতেন। খনা এমনই বুদ্ধিমতি ছিলেন যে, অটনাচার্য্যের ছাত্রেরা তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে পরাস্ত হইতেন, মিহিরকেও সময় সময় পরাজয় মানিতে হইত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সব কঠিন কঠিন বিষয় ছাত্রেরা বুঝিতে পারিত না, খনা অনায়াসে তাহা

তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ আচার্য্য দূরে বসিয়া কন্যার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন।

খনা এখন আর বালিকা নাই। তিনি বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মিহিরের সহিত বাল্যবন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রকৃত ভালবাসায় পরিণত হইতে লাগিল। মিহিরও খনাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রাণই উভয়ের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। সে আকুলতা বাল্যবন্ধুত্বে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে এক মধুর পবিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাইবার জন্য লালায়িত হইলেন। অটনাচার্য্য শিষ্য ও কন্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু মিহিরের সমস্ত পরিচয় ভাল করিয়া না পাইয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলেন না। এইরূপে আরও কিছুদিন চলিয়া গেল।

রাজা চন্দ্রকেতু তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মিহিরের সহিত তাঁহার দেখা হইল। মিহিরকে তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এক রকম, আর আজ দেখিলেন সেই মিহিরকে আর এক রকম। তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্যপূর্ণ সুন্দর শরীর,

তাঁহার মুখে বিদ্যা ও জ্ঞানের একটা উজ্জ্বল জ্যোতি। মিহিরের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এত দূরদেশে আসা সার্থক হইয়াছে দেখিয়া রাজা চন্দ্রকেতু সুখী হইলেন। ক্রমে তিনি মিহিরের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

মিহির এইবার মহা সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া রাজা চন্দ্রকেতুর সাহায্য, যশ ও গৌরব লাভ করিবার উত্তম সুযোগ; আর অপর দিকে তাঁহার নয়নের আনন্দরূপিনী মানসপ্রতিমা খনার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ। যাঁহাকে লাভ করিয়া জীবন মধুময় করিবার জন্য তিনি আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, দেশে ফিরিলে এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন তাহা মিহির ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাত দিন ভাবিয়া অবশেষে এক কৌশল আবিষ্কার করিলেন। তিনি চন্দ্রকেতুকে বলিলেন, মহারাজ, আপনি আমাকে যে গৌরব দান করিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে খুবই লোভের সামগ্রী, আর আপনার আদেশ অবহেলা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কিন্তু আমি এখনও ছাত্র। এখনও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ শিক্ষা করিতে পারি নাই, কাজেই আমার ভয় হইতেছে

যে, আপনি আমার উপর যে কাজের ভার দিবেন, তাহা হয়ত আমি ভালরূপে করিতে পারিব না। আমার গুরুদেব অটনাচার্য্যকে যদি লইয়া যাইতে পারেন, তবে আপনার রাজ্য ও সভা ধন্য হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত।”

মিহিরের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তোমার গুরুদেব যদি দয়া করিয়া আমাদের দেশে যান, তবে উত্তমই হয়। কিন্তু তিনি কি কাশীধাম ছাড়িয়া বাঙ্গলা দেশের একটি পল্লীগ্রামে যাইতে রাজি হইবেন?”

মিহির কহিলেন, “এ বিষয়ে তাঁহার অসম্মতির বিশেষ কোনও কারণ দেখি না। কাশীধাম তাঁহার জন্মভুমি নয়, এবং এখানে তাঁহার আকর্ষণও তেমন কিছুই নাই। একটি মাত্র কন্যা লইয়াই তাঁহার সংসার, কন্যাটিকে লইয়া কাহারও আশ্রয়ে সুখে শান্তিতে থাকাই তাঁহার ইচ্ছা। এইরূপ অবস্থায় আপনার মত একজন আশ্রয়দাতা পাইলে তিনি যাইতে অস্বীকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।”

মিহির খুব সুন্দর কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। অটনাচার্য্যকে লইয়া দেশে ফিরিতে পারিলে, তাঁহার উভয় দিকই রক্ষা পাইবে। যে খনাকে তিনি জীবন-সঙ্গিনী করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, সে আশাও তাঁহার কালে পূর্ণ হইবে, এবং চন্দ্রকেতুর মত

একজন রাজার সভায় স্থান পাইয়া যশ ও গৌরব লাভ করিবার সুযোগও নষ্ট হইবে না।

গঙ্গাতীরে ছায়া-শীতল নির্জ্জন স্থানে একটি কুটীরে অটনাচার্য্যের টোল। এক দিন প্রাতে অটনাচার্য্য তাঁহার আসনে বসিয়া আছেন, খনা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে একটা নূতন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় মিহির রাজা চন্দ্রকেতুকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অটনাচার্য্য চন্দ্রকেতুর পরিচয় পাইয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ের নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। অবশেষে চন্দ্রকেতু বলিলেন, "কাশীধাম অনেক দিন আপনার জ্ঞানচর্চ্চায় ধন্য হইয়াছে, এখন বাঙ্গলা দেশকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করিয়া ধন্য করুন। আমি আপনাকে সভাপণ্ডিতরূপে আমার রাজধানী চন্দ্রপুরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিলে কৃতার্থ হইব।"

অটনাচার্য্য বলিলেন, "সংসারে আমার আর কোনও লোভ বা আকর্ষণ নাই। আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয় এই কন্যাটির জন্য একটি সুখ ও শান্তির আশ্রয় লাভ করাই এখন আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনার দয়ায় যখন আমার সে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা আর পরিত্যাগ করিব না। বাঙ্গলা দেশই

আমার জীবনের শেষ বিশ্রামস্থল হইবে।" অটনাচার্য্যের উত্তর শুনিয়া রাজা খুব সন্তুষ্ট হইলেন, সকলের অপেক্ষা বেশী সন্তুষ্ট হইলেন মিহির।

চন্দ্রপুর অটনাচার্য্যের বাসস্থান হইল। রাজা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সভাপণ্ডিতের আসন দান করিলেন। খনা পিতার সঙ্গে রাজসভায় যাইয়া জ্যোতিস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের তত্ত্ব বাঙ্গলা-দেশের পণ্ডিতেরা তখনও কিছুই জানিতেন না, খনা সেই সব কঠিন বিষয় সভায় বসিয়া পণ্ডিতদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। যে কোনও কঠিন প্রশ্ন পণ্ডিতেরা তুলিতেন; অশেষ জ্ঞানবতী খনা অনায়াসে তাহার উত্তর দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। এই কিশোরীর নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্রের নূতন নূতন তত্ত্ব ও তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতেরা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ কি মানবী, না সরস্বতী? অটনাচার্য্য চন্দ্রপুরে আসিয়া মিহিরের সম্বন্ধে যে সমস্ত পরিচয় জানা প্রয়োজন তাহা পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এখন আর মিহিরের হাতে কন্যা সম্প্রদানে তাঁহার কোনই আপত্তি রহিল না। রাজা চন্দ্রকেতুও দেখিলেন, মিহিরের সঙ্গে খনার বিবাহ হইলে মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় অতি সুন্দর হইবে, তিনি আনন্দের সহিত এই বিবাহে সম্মতি দিলেন। শুভ দিনে মিহির ও খনার

হৃদয় এক অতি পবিত্র বন্ধনে বাঁধা পড়িল। উভয়েই উভয়কে পাইয়া পরম সুখী হইলেন। উভয়ের সুখস্বপ্ন এতদিনে সত্যে পরিণত হইল।

খনা এখন বাঙ্গালীর ঘরের বৌ। বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার চালচলন কথাবার্ত্তা তিনি অল্প দিনের মধ্যেই শিখিয়া লইলেন। কিন্তু বৌ বলিয়া তিনি কেবল ঘরের কোণে শুধু হাতাবেড়ী লইয়াই জীবন কাটাইতেন না। বিবাহের পরেও তিনি পূর্ব্বের মত রাজসভায় যাইয়া জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, আবার ঘরে তিনি ঠিক লজ্জাবতী বধূ। নিজ হাতে সংসারের সমস্ত কাজ ও রন্ধনাদি করিয়া স্বামী, পিতা, পরিজন ও ছাত্রদিগকে খাওয়াইতেন। গৃহকার্য্যে নিযুক্তা বধূ-বেশিনী সেই খনাকে দেখিয়া মনে হইত না যে, ইনিই সেই রাজসভায় জ্যোতিষতত্ত্ব-আলোচনা-কারিণী বিদূষী খনাদেবী।

মিহির ও খনার দিনগুলি একটানা সুখের স্রোতে কাটিয়া যাইতে লাগিল। দুঃখের লেশমাত্রও সে জীবনে নাই; কেবল আনন্দ, হাসি আর গান। জীবনে যে কখনও দুঃখ আসিতে পারে, অত সুখের মধ্যে তাহা তাঁহাদের মনেও স্থান পাইল না। একদিকে খনার নিত্য নব নব আবিষ্কারের গৌরব তাঁহাদের জীবনকে আরও মধুর করিয়া তুলিল। রাজা চন্দ্রকেতুর অজস্র করুণা

তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। দিক্‌দিগন্ত খনার যশে পূর্ণ হইল। সকলেই সেই রমণীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হইল। কিন্তু হায়, এই পৃথিবী হিংসার রাজ্য, এখানে একজনের উন্নতি বা গৌরবে অন্যের চোখে কাঁটা ফোটে, একজনের যশে অন্যের হৃদয় জ্বলিয়া যায়। খনার ঐরূপ গৌরব লাভও পণ্ডিতদের সহ্য হইল না। তাঁহারা নানাভাবে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন অটনাচার্য্য আর ইহলোকে নাই। মিহির একাকী পণ্ডিতদিগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। খনার অদৃষ্টে বিপদ ক্রমশঃই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময় এক ভীষণ ভূমিকম্পে বাঙ্গলাদেশের খুব অনিষ্ট হইয়া গেল। চন্দ্রকেতুর প্রজাদিগের মধ্যে হাহাকার পড়িল, অনেকের মৃত্যু হইল, রাজ্য প্রায় শ্মশান হইয়া গেল। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া রাজার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। ভবিষ্যতে যাহাতে ভূমিকম্প হইয়া রাজ্যের ঐরূপ সর্ব্বনাশ করিতে না পারে, সেইজন্য তিনি পণ্ডিতদিগকে যাগ-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। মিহিরও এই ব্যবস্থায় সম্মতি না দিয়া পারিলেন না। খনার নিকট যখন যাইয়া ঐ ব্যবস্থাপত্র উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহাতে মিহিরের নামের স্বাক্ষর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মিহির জ্যোতিষশাস্ত্রে

একজন সুপণ্ডিত হইয়াও কিরূপে তাঁহার মনে এই ভুল ধারণা স্থান পাইল যে, যাগ-যজ্ঞেরদ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আর ভবিষ্যতে ভূমিকম্প হইবে না? খনা প্রকাশ্য রাজসভায় পণ্ডিতগণের এই মতের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ভূমিকম্পের সহিত দেবতার কোনই সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে ইহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যাগ-যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়া ভূমিকম্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা এবং মূর্খতা মাত্র। একজন স্ত্রীলোকের এইরূপ স্পর্দ্ধা পণ্ডিতেরা সহ্য করিতে পারিলেন না। অপমানে ও হিংসায় তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিলেন। খনার সর্ব্বনাশের আয়োজন চলিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন, খনা একজন মায়াবিনী, ডাইনী, ভূমিকম্প ও লোকক্ষয় তাঁহার দ্বারাই হইয়াছে। দেশের লোকেরা পণ্ডিতদিগের কথাই বিশ্বাস করিয়া খনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। পণ্ডিতের দল প্রজাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। মিহিরের মনকেও বিষাক্ত করিবার জন্য খনার চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার কলঙ্ক-কাহিনী প্রচার করিতে লাগিলেন। দুষ্ট লোকের দ্বারা সবই সম্ভব। মিহির পণ্ডিতদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না, পতিব্রতা পত্নীর নির্ম্মল চরিত্রে

তাঁহারও সন্দেহ হইল। অবশেষে পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া প্রকাশ্য রাজ-সভায় খনাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা চন্দ্রকেতুও পণ্ডিতদিগের মতে মত প্রকাশ করিলেন; খনাকে চন্দ্রপুর হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইল।

খনা রাজার আদেশ শুনিলেন। কিন্তু দুঃখিত হইলেন না। যাহা সত্য, তাহা প্রচার করিয়া যদি প্রাণ যায় যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তবু যাহা মিথ্যা, তাহার প্রশ্রয় তিনি দিতে পারিবেন না। খনা নিজের জীবনের জন্য একটুও চিন্তা করিলেন না, বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাই তাঁহার ভাগ্যের লেখা; কিন্তু তিনি দুঃখিত হইলেন স্বামীর জন্য; স্বামী একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পণ্ডিতদিগের কথায় ভুলিয়া তাঁহার পবিত্র চরিত্রে সন্দেহ করিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান সমস্তই পণ্ডিতদিগের কুচক্রান্তের স্রোতে ভাসিয়া গেল! অবশেষে তিনিও এই নির্ব্বাসনদণ্ডে সম্মতি দিলেন! স্বামীর অগাধ স্নেহ, অসীম প্রেম, মিথ্যা অপবাদের নিকট পরাজিত হইল! স্বামীই সংসারে একমাত্র তাঁহার অবলম্বন, তাঁহার নিকট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি কিছুতেই জীবন রাখিতে পারিবেন না, আর যে জীবনে স্বামীর বিশ্বাস হারাইয়াছেন, সে জীবন রাখিয়াই বা লাভ কি?

প্রাতঃকালে মিহির পূজার ঘরে তাঁহার ইষ্টদেবী কালী প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, তখন খনাদেবী ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানমগ্ন স্বামীর সম্মুখে অবনত হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর স্বামীর দেবদুর্লভ মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া চিরজীবনের মত দেখিয়া লইলেন। আজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া টস্ টস্ করিয়া চোখের জল খনার চক্ষু হইতে মাটীতে পড়িল। মিহির চক্ষু মেলিয়া চাহিবামাত্রই খনা নিমেষের মধ্যে ছাগবলির খড়্গখানা তুলিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন! তাঁহার কাল চুলের রাশি লইয়া রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। মিহির 'খনা, খনা!' বলিয়া আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। খনা তখন পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে সেই পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এইরূপে ভারতের একটি গৌরবময় জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল। বহুদিন অতীত হইল, খনাদেবী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দৈনিক জীবনের সহিত জড়াইয়া আছে। সহস্র সহস্র বৎসরেও তাঁহার স্মৃতি ও কীর্ত্তি বিন্দুমাত্র ম্লান হইবে না।

সমাপ্ত